গ্রামের কথা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১

মূল্য ২৲ দুই টাকা
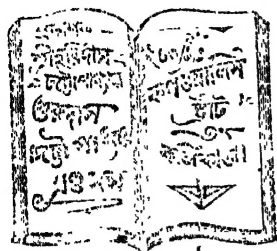
দত্তগিন্নী

১

দত্তগিন্নী তাঁর শুইবার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। বেলা তখন দেড় প্রহর আন্দাজ হইয়াছে। দত্ত মহাশয় ধূলা পায়, ছাতা হাতে, বেকী বেড়া ঘুরিয়া হঠাৎ উঠানের ভিতর দেখা দিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া দত্তগিন্নী চমকাইয়া উঠিলেন, হাতটা একটু কাঁপিয়া উঠিল, একটা আঙ্গুল একটু কাটিয়া গেল। আঙ্গুলটা আর এক হাতে চাপিয়া ধরিয়া গিন্নী বলিলেন, "এ কি, আজই এসে পড়লে?"

দত্ত মহাশয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "হাঁ, শালারা সব জোট করেছে, খাজনা দেবে না। তিন দিন ঘোরা-ফেরা করে' কিছুই করতে পারলাম না, তাই চলে এলাম। দেখি, সান্যালদের সঙ্গে মিলে কিছু করতে পারি কি না।" এই বলিয়া ঘরে বিছানো মাদুরের উপর ছাতাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া, চাদর ও গায়ের জামাটা বিছানার উপর ফেলিয়া, তক্তাপোষের উপর বসিয়া পাখার হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নী পিছু পিছু ঘরে গিয়া জামাটা কুড়াইয়া, তার পকেট হাতড়াইয়া পঁচিশটা টাকা সংগ্রহ করিলেন। টাকা কয়টা তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া তিনি ফস করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গিন্নী বাহির হইয়া গেলে দত্তমহাশয় দরজার কাছে একটু উঁকি মারিয়া দেখিলেন। গিন্নী তৎক্ষণে অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া, দত্তমহাশয় তাড়াতাড়ি কোমরের কাপড় খুলিয়া একটি গাঁজিয়া বাহির করিয়া এক গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। গাঁজিয়ার মধ্যে প্রায় শ' খানেক টাকা ছিল।

তার পর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক সাজিতে লাগিলেন, তামাকে আগুন ধরাইয়া দাওয়ার উপর কল্কেটা রাখিয়া তিনি হুঁকার জল বদলাইবার জন্য উঠিতেই, তাঁর মনে একটু খটকা লাগিল। গিন্নী এই নিশ্চিন্তমনে কুটনা কুটিতেছিল, হঠাৎ লাউটাকে আধ-কোটা অবস্থায় রাখিয়া উঠিয়া নিরুদ্দেশ হইল কোথায় ?

সন্দিগ্ধ চিত্তে হুঁকাটা হাতে করিয়া তিনি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীর পিছনে বেকী বেড়ার আড়াল হইতে ফিস্ ফিস্ শব্দে কথা শুনিতে পাওয়া গেল। দত্তমশায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। বেড়ার আড়ালে কি ছিল স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে দত্তমহাশয় একেবারে ফোঁসফাঁস করিতে লাগিলেন।

দত্তগিন্নীর ব্যাপারটা এই। যাহাকে বলে "স্বভাব-চরিত্র"। সেটা ভাল নয়,—তাহা সবাই জানে। দত্তমহাশয়ও প্রত্যক্ষ না দেখিলেও অনুমানে বরাবরই জানেন। আজ তিন দিন দত্তমহাশয় বাড়ী-ছাড়া, সাত ক্রোশ দূরে তাঁর একখানা মহালে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। এই কয়দিন দ্বিপ্রহরে এবং রাত্রে দত্তগিন্নী ইচ্ছামত বাড়ীতে প্রণয়ীজনকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। গোপাল ভাণ্ডারীর আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া দত্ত-গিন্নীর সঙ্গে আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্ন-যাপনের কথা ছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গৃহিনী তাই শঙ্কিত

হইয়া পড়িলেন। স্বামীর নিকট হইতে টাকা কয়টা হস্তগত করিয়াই তিনি গোপালকে সংবাদ দিয়া নিরস্ত করিতে ছুটিলেন। গোপালের বাড়ী পাশেই, মাত্র বিঘা-খানেকের একটা নিভৃত আম বাগান মধ্যে ব্যবধান। এই বেকী বেড়ার ওপারেই আমবাগান।

গোপালের বাড়ীর কাছে গিয়া একটা পরিচিত ইঙ্গিত করিতেই, গোপাল বাহির হইয়া আসিল। সংবাদ দিয়া ফিরিবার সময় দত্তগিন্নীর সঙ্গে সঙ্গে গোপাল এই বেড়া পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

এইখানে তাহাদের প্রেমালাপের শেষ অংশ দত্তমহাশয় বেড়ার আড়াল হইতে শুনিলেন। দত্তমহাশয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল।

ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দত্তমহাশয় কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, পাপিষ্ঠার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলেন। কিন্তু গোপাল ভাণ্ডারী বিষম ষণ্ডা, এবং সে অন্ততঃ তিনটা খুন করিয়াছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এ অবস্থায় দত্তমহাশয়ের যে সে সাহস হইল না, তাহাতে তাঁহাকে খুব দোষী করা যায় না। তাই তিনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হঠাৎ দত্তগিন্নী বেড়া ঘুরিয়া তাঁর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে দেখিয়া প্রথমে একচোট্ চমকাইয়া উঠিলেন—দত্ত-মহাশয় এত চমকাইয়া গেলেন যে, তাঁর হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া ফাটিয়া গেল।

গিন্নী চট্ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, চোখ-মুখ গরম করিয়া বলিলেন, "এখানে কি হচ্ছে?"

সে আওয়াজ শুনিয়া দত্তর আত্মাপুরুষ চমকাইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই—না, এই, এই—"

আরও জোর ধমক দিয়া গিন্নী বলিলেন, "বলি, এখানে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছিল ?"

দত্তমহাশয় দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "না, এই হুঁকোটায় জল ক'রতে এই।"

"হুঁকোর জল করবে তো বেড়ার ধারে মরতে এসেছ কেন ?"

"হ্যাঁ, তা, না,—" প্রভৃতি নানাবিধ অসংলগ্ন শব্দ করিতে করিতে দত্তজা পায় পায় প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী মৃদু গর্জ্জনে তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ঘরে ফিরিয়া দত্তমহাশয় দেখিলেন, তাঁহার তামাক ভস্ম হইয়া গিয়াছে, হুঁকাটিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি পায় পায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাশের ভট্টাচার্য্য-বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন।

২

দত্ত পরিবারের একটু পরিচয় আবশ্যক। শরৎ দত্ত মহাশয় সামান্য তালুকদার। তাঁর তালুকের মুনাফা প্রায় হাজার টাকা হইবে। ইহাতে পাড়াগাঁয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিবার কথা; বিশেষতঃ দত্ত মহাশয় তাঁর তালুকের গোমস্তাগিরি হইতে পাইকগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ নিজেই করেন। কিন্তু দত্তজার চেহারা দেখিয়া কেহই তাঁহার স্বচ্ছলতা অনুমান করিতে পারিত না। তাঁর শরীরে রোগ কিছুই নাই, তবু চল্লিশ বছর বয়সে তিনি জীর্ণশীর্ণ, শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য। তাঁর হাড়ে শক্তি আছে, তার পরিচয় তাঁর কষ্ট-সহিষ্ণুতায়। পাঁচ-সাত ক্রোশ হাঁটিতে তিনি কোনও দিন ক্লান্ত হন না। বাড়ীতে বসিয়া বেড়া টাট্টি দুরস্ত করা, "পালান" করা প্রভৃতি লইয়া তিনি সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকেন।

কিন্তু দত্তমহাশয়ের শরীরে জোর বড় কম, আর মনের জোর তার চেয়েও কম। এই কম জোর ও আনুষঙ্গিক ভীরুতাই তাঁর জীবনটাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁর পরনের কাপড় যে ময়লা ও ছেঁড়া, এবং বেশভূষা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, তাহার জন্য তাঁহার কৃপণতাই একমাত্র দায়ী নয়।

দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী কৃপাময়ী তাঁর প্রতি খুব কৃপাপরবশ ছিলেন না। অথচ দত্ত মহাশয় যেমন জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্রকায়, কৃপাময়ী সেই পরিমাণে বৃহৎ-কায় ও বলবতী। কৃপাময়ীর মত খাটিতে পারে, এমন মেয়েমানুষ এ তল্লাটে নাই। তিন-চার শো লোকের নিমন্ত্রণের রান্না রাঁধিতে হইলে গ্রামের স্বজাতির মধ্যে কৃপাময়ী ছাড়া গতি ছিল না। আর কৃপাময়ী হেঁসেলে ঢুকিলে সে কাহাকেও কাছে অগ্রসর হইতে দিত না। একা সে,

সমস্ত রান্না করিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচি সে আলগোছে নামাইত, আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ তরকারী সে নিমেষে পরিপাটি রূপে রাঁধিয়া নামাইত। রান্নার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও কৃপাময়ীর খুব নাম ছিল।

এ হেন শক্তিমতী ছিলেন দত্ত গৃহিণী। দত্ত-মহাশয়ের চেয়ে আধ হাত লম্বা, পরিধিতে প্রায় চতুর্গুণ, মাংসপেশীর দৃঢ়তায় অতুলনীয়। কাজেই গৃহিণীকে "শাসন' করিবার সঙ্কল্পও দত্ত মহাশয় কোন দিন মনে স্থান দিতে পারেন নাই—তিনি কৃপাময়ীকে রীতিমত ভয় করিয়া চলিতেন। কৃপাময়ী তাঁহাকে বেশ রীতিমত শাসনে রাখিত। তার জন্য তাহাকে খুব শক্ত কথা বা বাহু-বল কখনও প্রয়োগ করিতে হয় নাই, একবার চোখটা একটু গরম করিলেই দত্তজা একেবারে ভড়কাইয়া যাইতেন।

বলিয়াছি, দত্ত মহাশয় তার তালুকের গোমস্তা পাইক প্রভৃতি সকলই ছিলেন, কিন্তু খাজাঞ্চী ছিল কৃপাময়ী। এমন অকরুণ কঠোর খাজাঞ্চী, যে, বঙ্গদেশের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল তার কাছে হার মানেন। যখন যেখান হইতে যে টাকা আসিত, তাহা অবিলম্বে দত্তগিন্নী আত্মসাৎ করিয়া সিন্দুকে পুরিত এবং চাবি যখের মত সঙ্গে সঙ্গে রাখিত। একবার সে সিন্দুকে টাকা ঢুকিলে তাহা বাহির করিতে দত্ত মহাশয়ের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত —এবং তাহাতেও কোন ফল হইত না। প্রথম প্রথম এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, একবার দত্ত মহাশয় কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিয়াও কৃপাময়ীর নিকট হইতে সদর খাজনার টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। তার পর নাচার হইয়া জগন্নাথ সাহার নিকট তালুক বন্দক রাখিয়া সদর খাজনার টাকা জোগান। সেই টাকা শোধ করিবার জন্য দত্ত মহাশয় প্রথমে চুরি করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ আদায়-পত্র করিয়া তাহার মধ্যে কতক টাকা নিজে লুকাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট গৃহিণীকে দিতেন। পরে দত্তগিন্নী সদর খাজনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এমন বিপদে আর

দত্ত মহাশয়কে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু চুরি অভ্যাসটা তাঁর রহিয়া গেল। ক্রমে সাহস পাইয়া কিছু বেশী হাতে টাকা লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে চলিল না। দত্ত-গিন্নীর হিসাবের জ্ঞান বেশী ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের খাজনার টাকার পরিমাণে তাঁর লেখা ছিল। যখন দেখিলেন যে সমস্ত বৎসরে প্রায় পঁচিশ টাকা কম পড়িয়া গেল, তখন দত্তজার উপর চোটপাট আরম্ভ হইল। দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রজারা খাজনা দেয় নাই। প্রজাদের মধ্যে গ্রামের লোকই বেশী। কৃপাময়ী তাহাদের সকলকে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহারা সবাই খাজনা দিয়াছে এবং কেহ কেহ দাখিল খারিজের নজর পর্য্যন্ত দিয়াছে। তখন সে দত্তজাকে চাপিয়া ধরিল। শেষ পর্য্যন্ত দত্ত মহাশয়কে কবুল জবাব দিতে হইল এবং পোষ্টাফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের বইখানা গৃহিণীর কাছে গচ্ছিত রাখিতে হইল।

তার পর দত্ত মহাশয় এমন বেশী হাতে চুরির চেষ্টা করেন নাই, তবে ছুটকো-ছাটকা চুরি করিয়া বছরে এক'শ দেড়'শো টাকা রাখিতেন। সে টাকা সেভিংস্-ব্যাঙ্কে রাখিবার উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড়েও খরচ করিতে পারিতেন না, প্রায় কোন কাজেই তাহা লাগিত না। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে মহকুমায় গিয়া তাঁহার সঞ্চিত অর্থ খরচ করিবার চেষ্টায় কয়েকজন বন্ধু বান্ধব লইয়া বেশ্যালয়ে কিছু আমোদ প্রমোদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হায়, তাঁর অদৃষ্ট! বাতাস বুঝি সে খবর কৃপাময়ীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়! সে যা' নাকাল দত্তজার হইতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি জন্মের মত বেশ্যার নামে ভয় পাইতেন। কাজেই টাকা তাঁর বিশেষ কাজে লাগিত না।

যক্ষের মত যে টাকা কৃপাময়ী সংগ্রহ করিত, তাহা বুদ্ধিমানের মত সব সময় রাখিতে পারিত না। স্বামীর জ্ঞাতসারে কতক টাকা প্রজাদের মধ্যে সুদে খাটাইত, কিন্তু সে অল্প। বেশীর ভাগ টাকা সে গোপনে

"লাগাইত"। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের বই দেখিয়া সে একখানা বই করিল ; কিন্তু তা ছাড়া, সে আরও অনেক টাকা বেশী সুদে গোপনে খাটাইতে লাগিল। সে নিজে হিসাব-কিতাব জানিত না, এ সব কারবারও বুঝিত না, তাই গোপাল ভাণ্ডারীর সাহায্য লইতে লাগিল।

গোপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী বলিয়াই গ্রামে পরিচিত, কিন্তু সে নিজের নাম লেখে, শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র। তার পিতামহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সান্যাল মহাশয়দের বাড়ীর ভাণ্ডারী ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া তাহার পৌত্র সামান্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়া মিত্র উপাধি ধারণ করিয়াছে। গোপাল লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল এবং দলিল দস্তাবেজ লেখা ও জমিদারী-মহাজনীও কিছু কিছু জানিত। সে গ্রামের সকল লোকের দলিল লিখিত। তাহা ছাড়া সে অর্থের জন্য না করিত, এমন কার্য্য নাই।

এ হেন গোপাল ভাণ্ডারীর কাছে কৃপাময়ী গেল পরামর্শের জন্য। গোপাল তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িল না। তাহাদের টাকা-কড়ি খাটান সম্পর্কিত এই গোপন সম্পর্ক পরিপক্ক হইয়া অন্যরূপ দাঁড়াইল। এদিকে নানারূপ ফিকির-ফন্দীতে কৃপাময়ীর টাকা সিন্দুক ছাড়িয়া ক্রমে গোপাল ভাণ্ডারীর হস্তগত হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা গোপাল ভাণ্ডারীর উপর অবিচার করিব না। কৃপাময়ীর যত টাকা সে অত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার সবই চুরি নয়। তার একখানা উৎকৃষ্ট টিনের ঘরের সমস্ত খরচ কৃপাময়ী স্বেচ্ছায় তাহাকে হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

অথচ দত্ত মহাশয়ের নিজের বাড়ীতে টিনের ঘরের বংশও নাই। কাঁচা ভিটার উপর খড়ের তিনখানি ঘর অন্দর-মহল, আর বাহির-বাড়ীর একখানি ভঙ্গুর কুঁড়ে ঘর, ইহাই দত্ত বাড়ীর ঘরের ফিরিস্তি।

দত্ত-পরিবারের পরিচয় পরিপূর্ণ করিবার জন্য বলা আবশ্যক যে দত্ত-মহাশয় নিঃসন্তান, কৃপাময়ী বন্ধ্যা।

৩

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের পণ্ডিত। তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডিত্যের জোরে বেশ কিছু ব্রহ্মোত্তর হস্তগত করিয়া বংশধরদের জন্য রাখিয়া যান। বংশলোচন ভট্টাচার্য্য তাঁহার সপ্তম বংশধর। তাঁহার সেই উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের মতই বংশলোচন গ্রামের লোককে পাঁজি দেখিয়া ব্যবস্থা দেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন এবং আশে-পাশে চতুর্ব্বিংশতি গ্রামের পণ্ডিত বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তবে সাত পুরুষে পাণ্ডিত্য অনেকটা জলীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। বংশলোচন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া রঘুবংশের এক সর্গ সমাপ্ত করিয়াই স্মৃতি পড়িবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে যাত্রা করেন; সেখানে রঘুনন্দনের উদ্বাহ-তত্ত্ব ও শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক পড়িতে আরম্ভ করেন। মাসখানেক ব্যর্থ পরিশ্রমের পর তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে বিদায় করেন।

বংশলোচন অবিলম্বে দেশে না ফিরিয়া কাশী যান এবং সেখানে বৎসর খানেক কাটাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গ্রামের লোকে তাঁহাকে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া জানে, নবদ্বীপ ও কাশীতে তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ সম্বন্ধে নানারূপ কথা গ্রামে চলিত ছিল।

বংশলোচন এখন বৃদ্ধ। যে কিছু বিদ্যা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য শাস্ত্রে তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি যে সকল ব্যবস্থা দিতেন, তাহা যদিচ প্রায়ই শূলপাণি বা রঘুনন্দনের অনুমত হইত না, তথাপি গ্রামের লোক তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতের চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার সহিত পালন করিত।

ইহা ছাড়া ভট্টাচার্য্য বেশ সঙ্গতিপন্ন ও রীতিমত বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমায় ও গ্রামিক ঘোঁট পাকানোয় তাঁহার সমান পারদর্শিতা ছিল। সকল বিষয়েই তিনি গ্রামের একজন মাতব্বর। কাজেই তাঁহার বৈঠকখানা নানারকম লোকজনে সর্ব্বক্ষণ বোঝাই থাকিত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানা একখানা টিনের আটচালায়, তার পৈঁঠা বাঁধানো এবং মেজে সিমেণ্ট করা। ঘরখানার ঠিক মধ্যে বিস্তৃত ফরাশ, তাহার উপর ময়লা চাদর বিছানো। সেই ফরাসের কেন্দ্র স্থলে ছোট একখানা সাধারণ মির্জ্জাপুরী গালিচা পাতা। সেই গালিচার উপর ঠাকুর মহাশয়ের আসন। তার চারিদিকে—অর্থাৎ গালিচার বাহিরে তাঁহার পারিষদবর্গ। তক্তাপোষের বাহিরে চাটাই ফেলিয়া গ্রামের মুসলমান ও মাঝি মাল্লা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রজা।

দত্ত মহাশয় আসিতেই ভট্টাচার্য্য সমস্ত মুখ বিস্ফারিত করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "এই যে দত্ত ভায়া, ভাল সময়ে এসে পড়েছ।"

তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলেই মৃদু হাস্য করিল। দত্তজা কিছুই না বুঝিয়া সে কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "হাঁ, এসে পড়লাম, প্রজারা সব জোট করেছে, খাজনা দেবে না। কি আর করবো বসে' থেকে!"

বলিতে বলিতে ফরাশের উপর হাত বাড়াইয়া দত্তজা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত সদয়ভাবে এক পা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁর এক পাশে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়াছিলেন, দত্তজা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তার পর আর কোন কথা বার্ত্তা না বলিয়া বাঁ করিয়া গুপীদত্তের হাত হইতে হুঁকাটা একরকম ছিনাইয়া লইয়া একটা থামের আড়ালে গিয়া ভট্টাচার্য্যের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে, ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "শুনেছ ভায়া, তোমার গোপাল ভাণ্ডারীর কাণ্ডখানা। তার যন্ত্রণায় তো লোকে টি*কতে না পারার দাখিল!"

শরৎ দত্তের বুকের ভিতরটা গোপাল ভাণ্ডারীর নামে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আজ এই প্রকাশ্য সভায় কি ভট্টাচার্য্য গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে দত্তগিন্নীর প্রণয়-কাহিনী বলিয়া বসিবেন না কি?

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কাল সন্ধ্যা বেলায় রামজয় মালীর বউ পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল, ও বেটা না কি তাকে বে-ইজ্জত করবার চেষ্টা করে। করিম মণ্ডল আর কাকি সেখ সেখান দিয়ে হঠাৎ যাচ্ছিল, তাই রক্ষা হলো। কি বল করিম?"

চ্যাটাইয়ের উপরে বসিয়া করিম তাম্রকূটানন্দ উপভোগ করিতেছিল। দাও-কাটা তামাকের উগ্র ধোঁয়ার ঝাঁঝে মুখখানা লাল করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, কর্ত্তা। আমরা দেখি যে ভালো মানুষের বেটীর কি নাকাল। কাকি ভাই তখনই গিয়ে তার পিঠের উপর পড়ে পিছমোড়া দিয়ে ধরলো, আর আমি মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম।"

ফরাশের কোণায় বসিয়াছিল নটবর দাস,—স্বল্পভাষী লোক, কিন্তু নানারসে রসিক। সে একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "কোথায়?"

সকলে হাসিয়া উঠিল। করিম মণ্ডল মুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, এমন কথা কইবেন না। আমি তেমন মানুষ না। হাঁ।"

নটবর। ভাল রে ভাল, আমি বল্‌লাম কি? বলে, ঠাকুর-ঘরে কে রে? না, আমি কলা খাই না!"

আবার হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আরে রও নটবর, তোমার বাঁদরামি রাখো। ভাণ্ডারীর পোর তো কেবল এই এক কীর্ত্তি নয়, আরও কত কীর্ত্তিই তো

আছে। রোজ রোজ যে রকম উৎপাত আরম্ভ করেছে, তাতে গ্রামে বাস করা অসহ্য হয়ে উঠবে। এর একটা প্রতিকার চাই।"

শরৎ দত্ত বড় গলায় বলিল, "আপনি ঐ সব কথায় বিশ্বাস করেন? গরীবের ছেলে নিজের চেষ্টায় দু পয়সা করেছে দেখে লোকের চোখ টাটায়, তাই অমন কথা বলে। গোপাল মিত্তির সে রকমেরই নয়; আমি তো তার সঙ্গে হামেশা মিশছি, কারবার করছি,—অমন সৎস্বভাবের ছেলে আজ-কাল হয় না।"

ভট্টাচার্য্য। অবাক করলে দত্তজা! নবীন ভাণ্ডারীর ছেলে গোপালকে অবশেষে তুমিও মিত্তির বলতে আরম্ভ করলে যে! কালে কালে কতই শুনবো! কোন্ দিন দেখবো তুমিই শরৎ বাঁড়ুজ্জী হয়ে উঠেছ!

দত্ত মহাশয়। আজ্ঞে না, আমি ওর কুরসী-নামা দেখেছি, ওরা ফুলতলার মিত্তিরদের জ্ঞাতি। ওর ঠাকুরদা ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সান্ন্যাল-বাড়ীতে ভাণ্ডারী-গিরি করে।

ভট্টাচার্য্য। একবার ফুলতলার মিত্তিরদের কাছে ঐ কথা বলো দিকিনি, তারা কি বলে।

দত্ত। আমি কি তাদের সঙ্গে কথা না কয়েই বলছি। এই তো পরশুদিন ফুলতলা গিয়েছিলাম। নবীন ভাণ্ডারীর বাপ যে ফুলতলা থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা' তারা স্বীকার করে, কিন্তু তারা তাকে জ্ঞাতি বলে মানতে চায় না।

ভট্টাচার্য্য। আর তোমার এই মিত্তির মশায়ের ঠাকুরদাদা বিয়ে করেছিলেন কোন্ কুলীন-সমাজে? ত্রিপুরা দিদিকে তো সেদিনও আমাদের বাড়ী বাসন মাজতে দেখেছি। তার বাপেরা যে চৌদ্দপুরুষ আমাদের বাড়ী ভাণ্ডারী-গিরি করেছে। তার পর নবীন ভাণ্ডারীর মাগ,

তাকে তো গোবিন্দপুরের চৌধুরী-বাড়ী থেকে কিনে এনেছে, তার বাপেরা চৌধুরী বাড়ীর চৌদ্দপুরুষের গোলাম। সেই কুলীন-বংশে জন্মালেন কি না গোপাল মিত্তির!

দত্ত। ঠাকুর মশায়ের ঐ তো রোগ! আমি কাগজ-পত্তর দেখে বলছি, আর আপনি যা খুসি তাই বলে আমার কথা ভাসিয়ে দিলেই হবে! ফুলতলার মিত্তিরদের আদিপুরুষ—

ভট্টাচার্য্য। রাখো তোমার আদিপুরুষ। পাঁচশো ফুরসীনামা হাজির করলে আমার চোখের নজীর ভুলতে পারবো না। ত্রিপুরা দিদির নাতি নবীন ভাণ্ডারীর ছেলেকে তুমি মিত্তির মশায় বলে' মাথায় রাখ, আমি যে এদের তিন পুরুষ দেখে আসছি, আমার কাছে ও সব চলবে কেন!

নটবর দাস এমন সময় বলিল, "আজ্ঞে দত্ত মশায় ঠিক বলেছেন। গোপালের ঠাকুরদাদার বাপ ফুলতলার মিত্তিরদের জ্ঞাতি।"

দত্তমহাশয় বুক সোজা করিয়া বলিলেন, "ঐ শুনুন। নটবর কখনও বাজে কথা কয় না। বল তো ভাই, তুমি তো ফুলতলার কুটুম্ব।"

নটবর বলিল, "যা বলেছি সত্যি, তবে—"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন "তবে কি নটবর?"

নট। তবে তার মা ছিল তাঁতির মেয়ে আর তার বাপ-মার বিয়ে হয়নি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শরৎ দত্ত তাহাতে মাথা নীচু করিল না। সে আরও তেজের সহিত তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে, গোপাল ভাণ্ডারী সদ্বংশজাত, সে সচ্চরিত্র ও বিনয়ী, এবং গ্রামের লোক অযথা তাহাকে হিংসা করে। বিশেষ করিয়া শক্তি ও বুদ্ধিতে তাহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই, সকলে তাহাকে খাটো করিতে চায় ইত্যাদি।

এই তর্কে তার ঝাঁজ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চারিদিকের চাপা হাসি শরৎ দত্তের গায় ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল! যতই সে ইহাদের হাসির ভিতরকার শ্লেষটা উপলব্ধি করিতে লাগিল, ততই তাহার রক্ত গরম হইতে থাকিল। সে প্রাণপণ করিয়া গোপাল ভাণ্ডারীর পক্ষে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ-ক্রমে সে রামজয় মালীর বউ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোককে মুক্তকণ্ঠে কুলটা বলিয়া প্রচার করিয়া বসিল, করিম ও কাঞ্চিকে এক নম্বরের ফেরেববাজ ও কুচরিত্র বলিয়া প্রকাশ করিল, এক কথায় গ্রামবাসী কাহারও চরিত্রে কালিমা লেপন করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

নটবর দাস মাঝে মাঝে ফোড়ন দিতে লাগিল, আর সকলে মজাটা বেশ উপভোগ করিল।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে গোপাল ভাণ্ডারী আসিয়া উপস্থিত হইতে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। গোপাল দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, "দত্ত মশায়, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

দত্তমহাশয় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি কথা গোপাল?"

—"সান্ন্যালি মশায় আপনাকে বলতে বলেছেন। পাকদীঘির প্রজারা যে জোট করেছে, সেই সম্বন্ধে তিনি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছিলেন। তা আপনার সঙ্গে কথা না বল্লে তো সে সম্বন্ধে কিছু ঠিক করা যাচ্ছে না।"

—"তা চল, চল," বলিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দত্ত মহাশয় গোপালের সঙ্গে বাড়ী চলিলেন। তাহারা চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "হাসির কথা নয়। বেটাকে জব্দ না করলে ভদ্রলোকের পক্ষে গ্রামে বাস করা কঠিন।"

অথচ গোপালকে জব্দ করার কথা মুখে বলা যত সহজ, কাজে যে ত সহজ নয় তাহা সবাই জানিতেন। বাহুবলে সে অজেয়,—দুষ্ট বুদ্ধিতে সে স্বয়ং বৃহস্পতি, আর তার সহায় প্রবল-প্রতাপান্বিত সান্ন্যাল মহাশয়।

৪

দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর পরামর্শ-সভা বসিল,—বৈঠকখানায় নয় দত্তজায়ার শয়ন গৃহে। এ প্রস্তাব করিল গোপাল ভাণ্ডারী। দত্ত মহাশয়ের মনটা ইহাতে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি একবাক্যে সম্মত হইলেন।

পরামর্শ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। গোপাল দুই কথায় তাহার অভিপ্রায় জানাইল, আর দত্ত মহাশয় তাহাতে সায় দিয়া গেলেন। পরামর্শ শেষ হইলে গোপাল বলিল, "আপনি বাড়ী ফিরেই হঠাৎ না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেলেন, তাই বৌ-ঠাকৃরুণ আমাকে ডেকে বললেন, আপনাকে খুঁজে আনতে। আমি গিয়ে দেখি, আপনি ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরে বসে' আছেন। তাই আপনাকে উঠিয়ে আনলাম।"

এই বলিয়া গোপাল সোজা রান্নাঘরের দিকে চলিল। সেখানে গিয়া সে কৃপাময়ীকে ডাকিয়া বলিল, "বৌ-ঠাকৃরুণ, তোমার আসামী হাজির করে দিলাম; এখন কি বকশিশ দেবে দাও,—" বলিয়া রান্নাঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

দত্ত মহাশয় এক মুহূর্ত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিলেন। কি বেহায়া এই দুইটা! এত দিন কখনও ইহারা একেবারে দত্ত মহাশয়ের চক্ষের উপর এতটা মেশা-মেশি করিতে সাহস করে নাই। আজ বড় বেশী রকম সাহস! দত্ত মহাশয়ের কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি জানাজানি হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহারা যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। এতটা বরদাস্ত করিতে দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা হইল না। কিন্তু উপায় কি? তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বাহির-বাড়ীর দিকে চলিলেন, যেন কিছুই দেখেন নাই, এমনি ভাবখানা!

কিন্তু রান্নাঘর হইতে বড় হাসির শব্দ আসিতে লাগিল। কৃপাময়ী ও গোপাল বড় আনন্দ করিতেছে বলিয়া মনে হইল—দত্তজার মনের ভিতর বড় বিঁধিল। একটু ভাবিয়া তিনি একটা বুদ্ধি ঠাওরাইয়া রান্নাঘরের দিকে খুব কাশির শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তার পর দরজার কাছাকাছি আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "গোপাল ভায়া, স্নান করতে যাবে না? চল না, আজ নদীতে ডুব দিয়ে আসি।"

এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, কৃপাময়ীর সঙ্গে গোপালের এখনকার আলাপটা বন্ধ করা। তাহাতে কোন পরমার্থ লাভ হইবে, এমন কথা দত্তজার মনে হয় নাই, কিন্তু এই দুজনকার এখনকার সম্ভাষণটা কি জানি কেন তাঁর মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধিয়া বসিয়াছিল। এই উপস্থিত বেদনা দূর করিবার জন্য দত্ত মহাশয় এই উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

—"পোড়ারমুখো আবার মরতে এসেছে," অস্পষ্ট স্বরে এই কথা আবৃত্তি করিয়া কৃপাময়ী বলিল, "না, গোপাল এখন একেবারে খেয়ে যাবে। তুমি যাও, তাড়াতাড়ি নদীতে ডুব দিয়ে এসো গিয়ে। রান্না হয়ে গেছে।"

দত্ত মহাশয়ের বুকে এ কথায় যেন বিষের ছুরি বসিয়া গেল। নদীতে স্নান করিতে যাওয়ার মানে প্রায় আধঘণ্টার ফের। এ প্রস্তাবের মধ্যে কুচক্রান্তটা দত্তজার চক্ষে ধরা পড়িল।

ভারি বিষণ্ণ মনে দত্ত মহাশয় ঘরে গিয়া বিছানার উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে গোপালের হাত ধরিয়া কৃপাময়ী সেই ঘরের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয়কে সেখানে শয়ান দেখিয়া তাহারা চমকাইয়া উঠিল, ততোধিক চমকাইয়া উঠিলেন দত্ত মহাশয়।

চট করিয়া গোপালের হাত ছাড়িয়া দিয়া দত্ত গিন্নী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "এখনো পড়ে রয়েছ! স্নান করতে যাবে কখন?"

"এই যাচ্ছি" বলিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দত্ত মহাশয় মাথায় তৈল ঠাসিতে ঠাসিতে দুরবর্ত্তী নদীর ঘাটের দিকে চলিলেন,—বড় বিষণ্ণ মনে চলিলেন।

কৃপাময়ীর স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নয়, তাহা তিনি অনেকদিন হইতে জানেন। কিন্তু এতদিন সে কথাটা কৃপাময়ী যে যত্ন করিয়া তাঁহার কাছে গোপান করিত, তাতে তাঁর একটু এই আত্মপ্রসাদ ছিল যে, স্ত্রী অন্ততঃ তাঁকে এইটুকু খাতির করে। আজ হঠাৎ এরা এ কি আরম্ভ করিল? লুকাচুরির পরদাটুকুও যে রাখিল না! এখন তাঁহাকেই চক্ষু বুজিয়া না দেখিবার ভান করিয়া ইজ্জত বজায় রাখিতে হইবে।

বিষণ্ণ মনে নদীর ঘাটে যাইতে যাইতে পথে তাঁহার বাল্যবন্ধু কানাই নাপিতের সঙ্গে দেখা হইল। কানাই এখন সান্নাল-বাড়ীর হাপ্ গোমস্তা, হাপ্ পাইকের কাজ করে। আর অবসর-সময়ে ক্ষুর ও কাঁচি লইয়া পৈতৃক যজমানদের ঘরগুলি বজায় রাখে। রীতিমত ব্যবসা করে তার ভাই।

কানাইয়ের সঙ্গে দত্তজার শৈশবে অভিন্ন-হৃদয় সৌহার্দ্দ্য ছিল। দত্তজা কায়স্থ এবং ভদ্রলোক, কানাই নাপিত এবং ছোট লোক, এ ভেদ পাড়া-গাঁয়ে ছেলে বেলায় ছিল না। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা এই রকম একেবারে সম্পূর্ণ একাত্মভাবে মানুষ হইয়াছিল। তাহাদের দুইজনের শিক্ষাও প্রায় সমান, কারণ দত্তজা ও কানাই গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, দুজনেই পরীক্ষা দিয়াছিল। দত্তজা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কানাই পারে নাই। তাহার পর দত্তজার পিতার মৃত্যুতে তাঁহাকে বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে হইল; কানাইকে চাকরী ও ব্যবসা করিতে হইল, কাজেই বিদ্যা আর কাহারও বাড়িল না।

ক্রমে অবস্থা ভেদে দুই জনে অনেকটা তফাৎ হইয়া গেল। এখন

দত্তজা যেখানে ফরাসে বসেন, কানাই সেখানে চাটাই পাড়িয়া বসে। কানাই শরৎ দত্তর পায়ের ধূলাও লয়, সমীহ করিয়া কথাও বলে। তবু আজ পর্য্যন্ত সেই আবাল্য-সৌহার্দ্দ্যের কিছু অবশিষ্ট আছে।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে কানাইয়ের বিবাহ হয়। নাপিতের ঘরে বিবাহ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কাজেই সুযোগ-মত একটি মেয়ে যদি বিনা-পয়সায় বা অল্প পয়সায় পাওয়া যায়, তবে তাহাকে হাত-ছাড়া করা যুক্তি-যুক্ত নয়। এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। কানাইয়ের শাশুড়ী বিধবা হইয়া বিপন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। সাত বছরের মেয়ে লইয়া তাহার দাঁড়াইবার ঠাঁই ছিল না। কানাইয়ের পিতা তাহার মেয়েটির সঙ্গে কানাইয়ের বিবাহ দিয়া বিধবাকে ঘরে রাখিল। তাহার নিজের গৃহ শূন্য হইয়াছিল; পয়সা খরচ করিয়া বিবাহ করিবার তাহার অবস্থা ছিল না। বিশেষতঃ কানাইয়ের শাশুড়ী সুন্দরী ও গুণবতী। সুতরাং এই বিধবা নামে বিধবা থাকিয়াও কানাইয়ের বিমাতার স্থলবর্ত্তী হইল। বলা বাহুল্য, সমাজে এজন্য কানাইয়ের পিতা বা বিধবা নিন্দার্হ হইল না।

কানাই যখন বিবাহ করিল, তখন সে তার স্ত্রীর কথা বলিত শরৎ দত্তের কাছে—সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ীর কথাও বলিত। শরৎ দত্তের বিবাহ হইল ইহার বৎসর খানেক পরে, তখন সেও তার স্ত্রীর কথা গল্প করিত কানাই নাপিতের সঙ্গে। এই সব গোপন বিষয় লইয়া আলাপ বয়সের সঙ্গে কমিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু—তবু এই দুই জনের মধ্যে যতটা মন খুলিয়া কথা-বলাবলি হইত, তেমন আর কাহারও সঙ্গে হইত না।

শরৎ দত্তকে দেখিয়া কানাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শরৎ দত্ত বলিলেন, "কি রে কানাই, রায়গঞ্জ থেকে কবে এলি ?"

"এই এলাম। আপনার মুখখানা এত ভার কেন দত্ত মশায় ? বৌ-ঠাকরুণ কি কিছু বকুনি দিয়েছেন না কি ?"

"হাঁ,—না—তা ঠিক নয়।"

"হাঁ তা ঠিক নয়টা কি রকম হ'ল, বুঝলাম না।"

"সবই তো জানিস, কানাই, যে দজ্জাল স্ত্রী নিয়ে আমায় ঘর করতে হয়!"

"তা আর জানি না? তোমার স্ত্রী কি গোড়ায় আমার স্ত্রীর চেয়ে বেশী দজ্জাল ছিল? তুমি তাকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছ, তাই সে অমন করে। মেয়েমানুষ জাত, তাকে যেখানে রাখবে সেই খানেই শিকড় গেড়ে বসবে। মাথায় একবার চড়ালে সেখান থেকে তাকে নামায় কে! দেখ দেখি আমার পরিবারকে! আমি সাত চড় মারলেও তবু মুখে রা'টি শুনবে না।"

"তা দেখেছি। সে তোর বরাত রে ভাই, আর এই আমার বরাত।"

"বরাত নয় দাদা, আমার বেত। বিয়ের পর কয়েক দিন মাগী বড় তিড়িং তিড়িং করতে লেগেছিল। তার মা আমার বাবাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত, তাই দেখে দেখে মাগী শিখতো, আমার সঙ্গে সেই চাল ছাড়তো। আমি যাই একদিন চটাং চটাং বেত কষিয়ে দিলাম, সেই থেকে দুরস্ত হয়ে গেল। মেয়েমানুষকে শাসনে রাখতে হয়।"

"ও সব তোরা পারিস। নাপিতের ছেলে, পরিবারের গায়ে হাত তুললে লোকে কিছু বলবে না। আমরা তা করতে গেলে যে কেলেঙ্কারী হবে।" (বলা বাহুল্য কেলেঙ্কারীর চেয়ে শক্তির অভাব কথাটাই দত্তজা বেশী ভাবিতেছিলেন।)

"কেন? ওই নরহরি দাস যে উঠতে বসতে তার বউকে গুঁতুচ্ছে, তাতে তার কোন্ কলঙ্কটা হয়েছে আর জাতই বা কই গেল! তা' আমিই কি আর দিন-রাত বউকে পিটছি। ভর-জন্মে বড় জোর তিন

দিন মেরেছি, তাও দুদিন কেবল চড়টা পাবড়াটা। মারই খালি আসল কথা নয়। কোন-কিছুতেই আস্কারা দিতে নেই। সব বিষয়েই দাপটে রাখতে হয়! ধমকের মুখে রাখলে ওরা ভয় করতে শেখে। ভয় যদি না থাকে, তবে একেবারে ঘাড়ে চড়ে' বসে!"

তার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ বসিয়া সলা-পরামর্শ হইল। দত্ত মহাশয় অবশ্য তাহার কাছে প্রকাশ করিলেন না যে তাঁহার স্ত্রী অসতী, যদিও সেটা কানাইয়ের আগে হইতে জানা ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে যে মারামারিতে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ লজ্জার কথাটাও তিনি স্বীকার করিলেন না। ভয়কে করুণা ও ভদ্রস্থতার আবরণে ঢাকিয়া তিনি নাপিত বন্ধুর উপদেশ শুনিলেন। ফল কথা, স্নান করিয়া ঘরে ফিরিবার সময় তিনি মন স্থির করিয়া ফিরিলেন যে, আর স্ত্রীকে কোন বিষয়ে আস্কারা দিবেন না।

একে তো নদী অনেকদূর! তার পর আবার কানাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রণায় দত্তজা অনেকটা সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তাই তাঁর বাড়ী ফিরিতে অনেকটা দেরী হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, দত্ত গিন্নী চাদর মুড়ি দিয়া বিছানায় ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। গোপাল বাড়ী গিয়াছে।

বন্ধুর উপদেশ স্মরণ হইল। এখনি স্ত্রীকে ডাকিয়া ধমকাধমকি করিয়া তাহার দ্বারা ভাত বাড়াইয়া লওয়া আবশ্যক মনে হইল, কিন্তু সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দত্তজা স্থির করিলেন, হঠাৎ কোন কাজ না করিয়া একটু পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার।

রান্নাঘরে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, হাঁড়িকুড়ি সর্ব পরিষ্কার হইয়া গেছে। ঘরের এক কোণে দুইখানা এঁটো থালা রহিয়াছে। আর মধ্যস্থলে আসন করিয়া সামনে একথালা ভাত বাড়া ও ঢাকা রহিয়াছে। ইহা হইতে স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দত্ত মহাশয়ের Sherlock Holmesএর

সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল না। তিনি বুঝিলেন, গৃহিণী গোপালকে খাওয়াইয়া এবং নিজে খাইয়া পাক সারিয়া দত্ত মহাশয়ের জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছেন। এ অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে। কাজেই তাঁহার শাসন-প্রচেষ্টা স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গের কাল পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়া তিনি আহারে বসিলেন। খাইয়া দাইয়া শুইবার ঘরে নিঃশব্দ পদ-বিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া পাণ ও তামাকের যোগাড় করিয়া শেষে নিঃশব্দেই গিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলেন।

বৈকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দত্তজা দেখিলেন, দত্ত-গিন্নী মহা-সমারোহে পিঠে তৈয়ার করিতে বসিয়াছেন। দেখিয়া দত্তজা প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

তিনি কানাই নাপিতকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন, "আজ আবার এতগুলো পিঠে হচ্ছে কিসের জন্যে?"

কৃপাময়ী ধোঁয়া হইতে আপনার চোখ আড়াল করিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যের স্বরে বলিল, "গোপাল খেতে চেয়েছিল তাই ক'খানা পিঠে করেছি।"

দপ্ করিয়া দত্তজার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখ গিন্নী, বড় বাড়াবাড়ি করছো। মনে ভাবছো আমি কিছু টের পাই না, বটে? আমি এ-সব হতে দেব না। গোপাল ত আর এ বাড়ীতে আসতে পাবে না, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও বাড়ী থেকে বেরুতে দিচ্ছি না।"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে কৃপাময়ী একবার দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া আবার পিঠে ভাজিতে লাগিল, তার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দত্তজা ভাবিলেন, তাঁহার ঔষধ ধরিয়াছে—তাই আর একটু মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন, "ওঠো, বলছি। ফেলে রাখ ও পিঠে। নৈলে সব আগুনে দেব।"

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কৃপাময়ী একবার দত্তজার দিকে চাহিয়া বলিল, "ফরফরিয়ো না, বলছি। বেরোও বাড়ী থেকে।"

"কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমাকে বেরোও! কার বাড়ী যে আমি বেরুব! বেরুতে তোকেই হবে। ওঠো শিগ্‌গির পিঠে ফেলে,

নৈলে—" বলিয়া দত্তজা পিঠের একটা বাসনে হাত দিতেই কৃপাময়ী লাফাইয়া উঠিয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া তাঁহার পিঠে দমাদম কয়েক ঘা বসাইয়া দিল।

দত্তজা হাউ-হাউ করিয়া গড়াইয়া পড়িলেন।

শব্দ শুনিয়াই হউক বা অমনি হউক গোপাল তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃপাময়ীকে নিবৃত্ত করিয়া দত্ত-মহাশয়কে সযত্নে সে উঠাইল ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দত্তগিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "এ তোমার কোন্ দেশী কারবার বউ ঠাকরুণ? স্বামীর গায়ে হাত তোলা! আর যে সে হাত তোলা নয়, একেবারে খুনের দাখিল! আমি না এসে পড়লে তো মেরে ফেলেছিলে আর কি, ছি!" এ সহানুভূতিতে দত্তজার অন্তর গলিয়া গেল।

এই তিরস্কারে কৃপাময়ী শুধু একবার কাতর নয়নে গোপালের দিকে চাহিয়া মুষড়িয়া গেল। সে নীরবে পিঠে ভাজিতে ভাজিতে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

দত্তজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখতো ভাই, দেখতো, ও আমাকে বলে কি না বেরিয়ে যাও! তার পর এই মার। বলতো, এ সব কি ভদ্র লোকের মেয়ের কাজ?"

গোপাল বলিল, "বাস্তবিকই তো! এ কি কথা! ভদ্রলোককে ভাল মানুষ পেয়ে যা-নয় তাই বলবে আর এমনি হাল করবে, এ কোন্ দেশী কথা?"

আর পিঠে ভাজা চলিল না। এ তিরস্কারে কৃপাময়ী মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন গোপাল আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "এতে কান্নার কি হলো? আরে মলো যা। শোনো না!" বলিয়া কৃপাময়ীকে এক রকম বুকের ভিতর টানিয়া সে মাথায় মুখে পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

দত্তজা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ইহাই হইল তাঁহার শাসন-প্রচেষ্টার শেষ ফল! গোপাল তাহার চক্ষের সামনে অম্লান বদনে তাহার স্ত্রীকে এমনি ভাবে সান্ত্বনা দিতেছে। কিন্তু এখন তো গোপালকে কোন কথা বলিবার মুখ তাঁহার নাই। সে তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে। "দূর হোক গে ছাই, যা হয় হোক। লোকের মুখ আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" বলিয়া দত্ত মহাশয় হাত পা—ছাড়িয়া দিলেন, দত্তগিন্নীকে সুস্থির করিয়া গোপাল আবার দত্ত মহাশয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

চেলা কাঠের ঘা খাইয়া দত্ত মহাশয়ের পিঠে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত হইল। তাহার টাটানি সারিতে অনেক দিন লাগিল—দত্তজা সে কয়দিন বিছানা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সমস্ত কথাটি অবশ্য গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দত্ত মহাশয় কবিরাজের কাছে বলিয়াছিলেন যে, তিনি হঠাৎ পা পিছলাইয়া একটা চেলা কাঠের গাদার উপর পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছেন। গ্রামের লোকেও তাঁহার সঙ্গে সেই ভানটা রক্ষা করিয়া কথা কহিত আর মুখ ফিরাইয়া হাসিত।

তবে সমস্ত কথাটা লোকে জানিত না; দত্তগিন্নী মারিয়াছিল সে কথা সবাই জানিত। কেন মারিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। গোপাল ভাণ্ডারী যে ইহার সঙ্গে কোন মতে জড়িত আছে, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ ছিল না।

পিঠের ঘা তখনও শুকায় নাই, কিন্তু দত্ত মহাশয় হাঁটিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন, তবে একটু নত হইয়া। সকাল বেলায় রান্নাঘর সারিয়া হাত ধুইয়া দত্তগিন্নী দত্ত মহাশয়কে বলিলেন, "আমাকে আজ পাঁচশো টাকা দিতে হবে। সামনের রবিবার আমার সাবিত্রী ব্রতের প্রতিষ্ঠা।"

দত্ত মহাশয় আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "টাকা আমি কোথায় পাব? তোমার সিন্দুকেই তো টাকা আছে, আমি কোথায় পাব?"

"না, আমার টাকা নেই। তুমি পোষ্টাপিস থেকে তুলে দাও।"

এ কথায় না বলিবার সাহস দত্ত মহাশয়ের অবশ্য ছিল না। কানাই নাপিত মিথ্যা বলে নাই, শাসন করিতে হইলে রোজ মারিতে হয় না। এক দিনের প্রহারে দশদিন ভয় জন্মায়। সেই চেলা-কাঠ পর্ব্বের পর দত্তমহাশয়ের ভিতর যা' কিছু বিদ্রোহ ছিল, তাহা একদম উবিয়া গিয়াছিল!

একবার দত্তমহাশয় বলিলেন, "আমি খোঁড়া হ'য়ে রয়েছি, কেমন ক'রে' যাবো পোষ্টাপিসে?"

অমনি একটা চাবুকের মত জবাব আসিল, "তোমায় যেতে হবে না, গোপালকে বলে রেখেছি, সেই টাকা তুলে দেবে।"

গোপাল! গোপাল! গোপাল! দত্ত মহাশয়ের অন্তর কৃপাময়ীর মুখে এই নাম শুনিয়া জ্বলিয়া খাক্ হইয়া গেল। আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ফর্‌ম্ সহি করিয়া দিলেন।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক সেদিন ও তার পরের তিন দিন বন্ধ, গোপালের নিকট এ সংবাদ জানিয়া আসিয়া, কৃপাময়ী আবার স্বামীকে উৎপীড়ন করিতে

লাগিল, "কোনোখান থেকে টাকাটা আজ জোগাড় না করে' দিলেই নয়।"

দত্তমহাশয় আবার ওজর তুলিলেন, "আমি এখন কেমন করে' কোথায় যাই, বল দেখি।"

অমনি কৃপাময়ী বলিলেন, "তোমার যেতে হবে না, গোপালের কাছে টাকা আছে, সেই দেবে,—তুমি কেবল একখানা হ্যাণ্ডনোট সই করে দেবে।" বলিয়া একখানা গোপালের হাতে লেখা খসড়া হ্যাণ্ডনোট দত্ত-মহাশয়ের সামনে ধরিল।

দত্ত মহাশয় হ্যাণ্ডনোটখানা সই করিবার জন্য কালি কলম লইয়া বলি-লেন, "টাকা কই?"

"সে আমি গোপালের ঠেঁয়ে নিয়ে আসবো গিয়ে,—তুমি কাগজখানা সই করে দাও।"

দত্ত মহাশয় গোপালের বরাবর হ্যাণ্ডনোট সহি করিয়া দিলেন। কিন্তু এই হ্যাণ্ডনোটে তিনি যে টাকা কর্জ্জ করিলেন, সে তাঁহার নিজেরই টাকা, তাঁর স্ত্রীর সিন্দুকে মজুত ছিল। হ্যাণ্ডনোটখানি স্ত্রী আদায় করিলেন গোপালের বেনামীতে।

ধুম করিয়া সাবিত্রী-ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইল। দত্তমহাশয় ও দত্ত-গৃহিণী দুইজনেই কৃপণ ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে গৃহিণী অনেক টাকা খরচ করিয়া বসিলেন। তাই বলিয়া ঠিক পাঁচশো টাকাই খরচ করেন নাই, আন্দাজ সাড়ে তিন শো টাকা খরচ করিয়া বাকী টাকা চুরি করিলেন।

সতেরো জন ব্রাহ্মণ-কুমারী এবং সতেরো জন সধবা ব্রাহ্মণী সংগ্রহ করিতে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ-বাড়ী উজার হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা নিজেরাই আয়োজন করিয়া আহারাদি করিয়া দক্ষিণা ও ডালি লইয়া বিদায় হইলেন। নানা দ্রব্য-সম্ভারে ডালি সাজাইয়া কৃপাময়ী স্বামীর পূজা করিলেন।

দত্তমহাশয় কৃতার্থ হইয়া সে পূজা গ্রহণ করিলেন এবং কৃপাময়ী যখন গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখন তাঁহার অন্তর আনন্দে ও গর্ব্বে অভিভূত হইয়া উঠিল।

উৎসব সারাদিন ভরিয়া চলিল। গোপাল ভাণ্ডারী কোমরে গামছা বাঁধিয়া মহা হাঁটাহাঁটি লাগাইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং হুঁকা হাতে সমস্ত তদ্বির করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্যের কার্য্য যত্ন ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন করিলেন। সকলেই দত্তগিন্নীকে আশীর্ব্বাদ ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণের দল বাহিরে আসিলে নটবর দাস বলিল, "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" আর দত্তবাড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "সাবিত্রীভ্যো নমঃ।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কৃপাময়ীর সাবিত্রী ব্রতের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড পরিহাস লুকানো আছে, সেটা এতক্ষণে প্রকাশ হইল। কিন্তু সে কারণে কোন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-কন্যা বা ব্রাহ্মণী নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অসম্মত হন নাই।

কেবল একজন ছাড়া। তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল না; কেন না তিনি বিধবা, কিন্তু তাঁর দুটি ছোট মেয়ে ছিল, তাহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে যাইতে দেন নাই। এই "অদ্ভুত" জীবটি শ্রীমতী শ্যামা ঠাকুরাণী। ইনি দূরসম্পর্কে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভগ্নী, নিতান্ত দরিদ্র এবং সম্পূর্ণ রূপে ভট্টাচার্য্যের আশ্রিতা।

৭

শ্যামা দেবীর বয়স পঞ্চাশের উপর। বর্ণ গৌর, নাক-মুখ চোখ সবই তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তাঁহার কথার আঁচ ভয়ানক। ভট্টাচার্য্যের সংসারে তিনি একা চারটি লোকের খাটুনী খাটিয়া তবে একবেলা দু'মুঠো অন্ন পান, এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খোঁটা ও গালি-গালাজ খাইয়া থাকেন। এই সকলের প্রধান কারণ, তাঁহার শুচিবাই। তিনি মাছের কাঁটা ও ভাত খুঁটিয়া আর স্নান করিয়া ও কাপড় কাচিয়া দিনের অর্দ্ধেক ভাগ কাটাইয়া দিতেন। এও সহ্য হইত, কিন্তু তার চেয়ে অসহ্য হইয়াছিল তাঁহার সতীত্বের শুচিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে সতীত্বকে অবশ্য-পালনীয় নারীধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং নারীর পক্ষে সতীত্ব-হানিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাতক বলিয়া জানিতেন। যাহাকে অসতী বলিয়া জানিতেন বা সন্দেহ করিতেন, তাহাকে তিনি স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন, তাহাদের স্পৃষ্ট কোন জিনিস কখনো খাইতেন না। তাঁহার এই শুচিবাই ক্রমে গ্রামের প্রায় ষোল আনা স্ত্রীলোকের উপর গিয়া পড়িল। তাহাতে সব ক্ষেপিয়া উঠিল! সবাই অসতী, আর উনি বড় সতী, এই দেমাকটা কেহ সহ্য করিতে পারিত না।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর তিনি ছিলেন দু'চক্ষের বিষ। গৃহিণী নিজে অসতী ছিলেন না; তবে পাড়ার অসতীদের কলঙ্কের কাহিনী লইয়া মেয়ে-মহলে আলোচনা করিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন শ্যামা দেবী এমনি একটা আলোচনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বউ, এ সব পাপের কথা বল্লেও মন ময়লা হয়, তার চেয়ে মহাভারত রামায়ণ পড় না কেন!" সেই হইতে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী শ্যামার উপর হাড়ে চটা।

যখন শ্যামা তাঁহার মেয়ে-দুটীকে কৃপাময়ীর ব্রত-প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণে যাইতে বারণ করিলেন, তখন এই কথা লইয়া অন্দরে খুব একচোট কলহ হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গলা ছাড়িয়া বলিলেন, "ওরে আমার সতী সাবিত্রীরে—গ্রামের সবশুদ্ধ অসতী আর উনি সতী! এত যদি সতী হয়েছিলে, তবে এ দশা হল কেন?

এ কথার কোন উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলেও শ্যামা তর্কে পশ্চাৎপদ হইলেন না; কোঁদল রীতিমত বাধিয়া উঠিল। শ্যামা বলিলেন, অসতীর অন্ন যে খায় তারই সে পাপ স্পর্শে, তা' ছাড়া তার মতিগতি খারাপ হইয়া যায়! ইহাতে ভট্টাচার্য্য-গিন্নী আরও তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ঝগড়া বাড়িয়া চলিল।

এমন সময় ভট্টাচার্য্য দত্তবাড়ী হইতে ফিরিলেন। গিন্নী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাড়িয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ওগো, তোমার পাঁজি-পুঁথি তুলে রাখো, আমাদের এই তর্কালঙ্কার মশায় পাঁতি দিয়ে তোমাদের সবাইকে একঘরে করে' দিয়েছেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন বড় তার্কিক; কিন্তু এ কোন্দলের ক্ষেত্রে তিনি সব কথা শুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। শ্যামা বলিলেন, "লজ্জা হয় না বউ, গুষ্টিশুদ্ধ একটা মেয়ের অন্ন খেয়ে এলি, যার নাম করলে নরকে যেতে হয়। আবার বড় গলায় তর্ক করতে যাস্! যা' করিস্ চুপচাপ কর, আর ঢাকঢোল বাজিয়ে কোঁদল করতে আসিস্ নে! ঘেন্না হয় না?"

"বটে রে মাগী, আমরা নরকে যাব আর তোর জন্যে বৈকুণ্ঠে বাড়ী হচ্ছে! নচ্ছার মাগী, সাতকাল কুল ভাসিয়ে সোয়ামীর কুল বাপের কুল খেয়ে এখানে মরতে এসেছেন, আবার পাদ্রীগিরী করছেন, দেখ। আমাদের দেখে যদি এত ঘেন্না পায়, তবে আমার ভাতগুলো গিলিস্ কোন্ লজ্জায়?"

এ প্রকার ঝগড়ায় ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর জয় অবশ্যম্ভাবী। শ্যামা দেবীকেই বাধ্য হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল! কিন্তু তিনি একটা অসমসাহসের কাজ করিয়া বসিলেন। মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া অনাথা বিধবা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, সে দিনকার মত চক্রবর্ত্তীবাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্যামা ঠাকুরাণী যে কথাটা তুলিলেন, সেটা এই কারণে খুব রাষ্ট্র হইয়া গেল; আর গ্রামের প্রত্যেক স্থানে এই কথা লইয়া খুব তোলাপাড়া চলিতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা যে এত বড় পাপিষ্ঠাকে এমনি করিয়া সমাদর করিলেন, ইহাতে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, যুবকেরা ঘোরতর তর্ক করিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা আস্ফালন করিতে লাগিল।

এমনি একটা মজলিসে একদিন শ্যামা ঠাকুরাণীরই কথা আলোচনা হইতেছিল। সকলে একবাক্যে শ্যামার পক্ষ লইয়া দত্তগৃহিণীর চরিত্রের নানা দোষ কীর্ত্তন করিতেছিল। এমন সময় দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবই শুনিলেন। রাগে তাঁহার ব্রহ্মতালু ফাটিবার উপক্রম হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সবাই চুপ মারিয়া গিয়াছিল; তিনি খোঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বাপু, সবাই বড় যে চুপ মেরে গেলে! কি কথা হচ্ছিল?"

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। নিধিরাম বলিয়া একটা নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছোকরা বলিয়া বসিল,

"দত্তগৃহিণীর কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

"হাঁ, সে আমি শুনেছি। শুনেছি বলেই জিজ্ঞাসা করছি। তা বাপু, তোমাদের সে কথা আলোচনা করবার কি অধিকার আছে, শুনি?"

বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সংলগ্ন ও অসংলগ্নভাবে তাহাদিগকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। একবার তিনি পত্নীর চরিত্র-দোষ অস্বীকার করিলেন, আর একবার বলিলেন, সে দোষ থাক বা না থাক অন্য লোকের তাতে মাথাব্যথা কেন! আবার বলিলেন, গোপাল ভাণ্ডারীর মত মহাপুরুষ জগতে আছে কি না, সন্দেহ! তা' ছাড়া সমস্ত দলকে অপোগণ্ড, ডেঁপো, ডানপিটে, বদমায়েস বলিয়া গালিগালাজ করিলেন। আবার বলিলেন, কৃপাময়ী যদি অসতীই হয়, তবে সতীই বা কে—একে একে সমস্ত গ্রামবাসিনী ভদ্রমহিলাদের চরিত্রে নিঃসঙ্কোচে তিনি কালিমা লেপন করিয়া গেলেন।

ছোকরারাও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা তাঁহার সঙ্গে সমানে গালিগালাজ চালাইতে লাগিল; আর শাসাইল। দত্তজাকে সমাজে বন্ধ দেওয়া হইতে ঘরে আগুন দেওয়া পর্য্যন্ত নানারকম ভয়ই আকারে-ইঙ্গিতে বা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানো হইল। তাহার জন্য যে শ্যামা ঠাকুরাণী বেচারীকে ঘর ছাড়া হইতে হইয়াছে, এ অপরাধ তার গ্রামবাসী ভুলিতে পারিবে না, ইত্যাদি নানা কথা হইল।

দত্ত মহাশয় যখন প্রচণ্ড বেগে তর্ক চালাইতেছেন, তখন গোপাল ভাণ্ডারী আসিয়া তাঁহাকে এক রকম বগল-দাবা করিয়া লইয়া গেল।

উপস্থিত ব্যাপারটা ইহাতে থামিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার পর এমন-ব্যাপার একটু ঘন ঘন ঘটিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকে দত্ত মহাশয়ের আড়ালে কৃপাময়ীকে লইয়া কানা ঘুষা করিয়াছে, হাস্য পরিহাস করিয়াছে, কিন্তু এ সব আলোচনার মধ্যে সর্ব্বত্রই দত্ত মহাশয়ের প্রতি কতকটা কৃপা ও সহানুভূতির ভাব ছিল। দত্ত মহাশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক, কাহারও কোনও অনিষ্ট করিবার মত মনের বলই তাঁর ছিল না। কাজেই লোকে তাঁহার প্রতি একটু সদয় ব্যবহারই করিত, এবং তাঁহার

দিকে চাহিয়াই কৃপাময়ীর কথা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিত না। কিন্তু তিনি যখন আগ বাড়াইয়া কৃপাময়ী ও গোপাল ভাণ্ডারীর পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিলেন এবং অপরকে এতটা বাড়াবাড়ি করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন, তখন লোকেরও রোখ বাড়িয়া গেল। এখন তাহারা দত্তজাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কৃপাময়ীর কথা লইয়া রহস্য করিতে লাগিল। কৃপাময়ী, গোপাল ও দত্তজাকে লইয়া গান বাঁধিয়া তার বাড়ীর আশেপাশে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং পথে ঘাটে দত্তজাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল।

কৃপাময়ী ও গোপাল কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তাহারা কেহই এ সব কোন কথা কাণেই তুলিত না। তাহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ঠিক পূর্ব্বেরই মত দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল। কৃপাময়ী ঠিক পূর্ব্বের মত নির্জ্জন ঘরেও আধ হাত ঘোমটা টানিয়া সম্পূর্ণ নীরবে কাজ করিয়া যাইত, পাড়ায় বেড়াইত, প্রতিবেশীর বাড়ীতে বড় কোন অনুষ্ঠান হইলে কাজ করিত। আর গোপাল সান্ন্যাল মহাশয়কে কুপরামর্শ দিত, লোকের মধ্যে মামলা বাধাইত, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত। ইহাদের জীবনের ভিতর এই সব গ্রাম্য গোলযোগ একটুও উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের মতিগতির একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। গোপাল ভাণ্ডারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভয়ানক অনুগত হইয়া পড়িল। সান্ন্যাল মহাশয়দের আশ্রয়ে থাকিয়া সে ভট্টাচার্য্যকে এতদিন কতকটা অগ্রাহ্যই করিয়া আসিয়াছে। কোনও রকমে প্রকাশ্য-ভাবে সে কোন রকম অশ্রদ্ধা বড় একটা প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু বড় একটা গ্রাহ্যও করিত না। কিন্তু এখন সে ভট্টাচার্য্য বাড়ী দুবেলা আনা-গোনা করিতে লাগিল। পথে কোথাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিতে পাইলে সে অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াও তাঁর পায়ের ধূলা না লইয়া ছাড়িত না।

আর প্রায়ই সে গোপনে যাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পরকে ঠকাইবার নানা রকম ফিকির-ফন্দী বাতলাইয়া দিত। ভট্টাচার্য্য ধূর্ত্ত লোক। এ হঠাৎ-ভক্তির যে কোনও মূল আছে, তাহা তিনি না বুঝিতেন এমন নয়। কিন্তু গোপালের দুষ্ট বুদ্ধি অসামান্য। তাহার মন্ত্রণায় তিনি নিজেকে এতটা লাভবান মনে করিলেন যে, তিনি গোপালকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

কৃপাময়ীর চিরদিনই ধর্ম্মে মতি ছিল। গ্রামে যে কয়টি গৃহদেবতা ছিলেন, প্রত্যেকের মন্দিরে সে গিয়া নিত্য গড় করিয়া আসিত, আর ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে ঠাকুর-সেবার কাজ সে নিজে উপযাচক হইয়া রোজ করিত, আর এমন সৌষ্ঠবের সঙ্গে করিত যে, ভট্টাচার্য্য গৃহিণী তাহাতে কৃপাময়ীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে সে নিত্য গিয়া সকলকে প্রণাম করিত, আর এটা-ওটা-সেটা পাঠাইত। ইহার উপর এখন তার যেন ধর্ম্মকর্ম্মে রোখ্ চাপিয়া গেল। সে অনেকগুলি ব্রত-নিয়ম করিতে লাগিল, আর গ্রামের লোকদিগকে, বিশেষ ব্রাহ্মণদিগকে, খাওয়াইয়া পেট ভারা করিয়া দিল।

এ বুদ্ধি তাহাকে দিয়াছিল গোপাল। সে বুঝাইয়াছিল যে, এমনি করিলে ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী কৃপাময়ীর হাতে থাকিবে। সুতরাং গ্রামের লোক যতই কেন গান বাঁধুক না, তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে কেহ পারিবে না। এ বুদ্ধি সুবুদ্ধি; কিন্তু ইহার তলায় গোপালের আর একটা কুবুদ্ধিও ছিল। যে কোন ধর্ম্ম-কার্য্য বা উৎসব কৃপাময়ী করুক না কেন, সে দত্ত মহাশয়কে তাহার পরিচালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। স্বামীর হাতে টাকা দিলে চুরির সুবিধা হইবে না; তা ছাড়া স্বামীও যে সে টাকার মধ্যে হাত বসাইতে পারে, এ সন্দেহ তার ছিল। তাই সে সব কেনা-কাটা প্রভৃতি টাকার কারবার করিত তাহার পরম বিশ্বাসী গোপালকে দিয়া। গোপাল ইচ্ছামত তাহার যে অংশ হউক গাফ করিলেও তাহা ধরিবার ক্ষমতা কৃপাময়ীর ক্ষমতা ছিল না। কাজেই কৃপাময়ী যতই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিত, ততই গোপালের সিন্দুক ভর্ত্তি হইয়া উঠিত।

এত করিয়াও যে তাহারা গ্রামের ঘোঁট নিবারণ করিতে পারিল না, সে কেবল দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর চরিত্র-প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে। তিনি যতই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিলেন, ততই গ্রামের লোকের রোখ চড়িয়া গেল। শেষে দত্ত মহাশয়কে জাতিচ্যুত করিবার প্রস্তাব-সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইহার আর একটা কারণ ছিল। শ্যামা ঠাকুরাণীর উপর লোকে কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁহার স্বভাব চরিত্র যে পরিমাণে নিষ্কলঙ্ক, ঠিক সেই পরিমাণে উগ্র ছিল। নিজে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ বলিয়া তাঁর বেশ অহঙ্কার ছিল এবং সেই অহঙ্কারে তিনি গ্রামের সকল লোককেই বিশেষ স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদাই খোঁচা দিতেন।

গ্রামের মেয়েদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যত রকম কলঙ্ক ছিল, তাহা লইয়া কারবার করিত বিশেষ ভাবে দুইজন। রাইমণি নাপিতদের বিধবা মেয়ে। সে ইহা লইয়া বাড়ী ঘুরিয়া মেয়ে-মহলে রস ছড়াইত ও আসর জমাইত। তার নিজের চরিত্র বয়স-কালে খুবই খারাপ ছিল, আর এখন সে ছিল গ্রামের যুবতীদের অভিসারের প্রধান সহায়। কাজেই সে অনেক খবর রাখিত, আর অকুণ্ঠিত চিত্তে খবর তৈয়ার করিয়া সতী নারীর নামেও কলঙ্ক রটাইত। তার এই সব রসের কথা শুনিবার জন্য মেয়ে-মহলে আগ্রহের অন্ত ছিল না। ঝী বউ হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নূতন খবর শুনিবার জন্ত তাহাকে ডাকিয়া গল্প করিত, আর সে কথা শুনিয়া আমোদ করিত।

আর একজন ছিলেন শ্যামা ঠাকুরাণী। তাঁহার আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের—তার ভিতর আদি-রসের অংশও ছিল না! তিনি সকল সত্য ও কল্পিত কাহিনী অকপটে বিশ্বাস করিতেন এবং সেই জন্য গ্রামের তিন পোয়া স্ত্রীলোককে অসতী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের উপর নিজের

অন্তরের সমস্ত উগ্রতা ঢালিয়া দিতেন। যাহাকে তিনি অসতী বলিয়া মনে করিতেন, মুখের কথায় ও আচরণে তার প্রতি অপরিমেয় ঘৃণা জ্ঞাপন করিতে তিনি কোন দিন দ্বিধা করিতেন না—এমন কি তাঁর আশ্রয়দাত্রী ও পালয়িত্রী ভট্টাচার্য্য-গিন্নীকেও তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। তাই তার স্বল্প অবসরের অধিকাংশই ঘরে বাহিরে ঝগড়া ও কোন্দল করিয়াই কাটিত। আর কোন্দলে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল অদ্বিতীয়।

এই জন্য শ্যামা দেবী কাহারও প্রিয়পাত্রী ছিলেন না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্রামের লোক হঠাৎ শ্যামা দেবীর প্রতি ভয়ানক সহানুভূতি বোধ করিতে লাগিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শ্যামাদেবীর আক্রোশ যে ষোল আনা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ভট্টাচার্য্য গৃহিণী পর্য্যন্ত জানিতেন, যদিও তিনি ইহা লইয়া এতটা হৈ-চৈ করার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। কিন্তু কেবল সত্যের খাতিরেই যে গ্রামের লোক এত বড় একটা অপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহা নহে। দত্ত মহাশয়ের ওকালতির চোটে লোকে যতই ক্ষেপিয়া উঠিল, ততই শ্যামার প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বাড়িয়া গেল।

তা ছাড়া শ্যামার দুর্গতির মাত্রাটা এত অধিক হইল যে, তাহাতে লোকে তার দুঃখে না কাঁদিয়া পারিল না।

শ্যামা যখন চলিয়া গেল, তখন ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পদে পদে তাহার অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। শ্যামা একা এত কাজ করিত যে, সে না থাকায় সংসার প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইল। তাই তিনি নিজে খাটো না হইয়া শ্যামাকে ফিরাইয়া আনিবার নানা রকম চেষ্টা করিলেন। ছোট ছেলে-পিলেদের মধ্যে যাহারা শ্যামার অত্যন্ত ন্যাওটা ছিল, তাহাদের একে একে তিনি চক্রবর্ত্তী বাড়ী পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে বহুবার শ্যামা এমনি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের অনুরোধে সহজেই ফিরিয়াছিলেন। এবার কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়-

প্রমুখ অপরাপর সকলকে দিয়া চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন। ভট্টাচার্য্যও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিলেন।

ইহার পর চক্রবর্ত্তী গিন্নীর সঙ্গে শ্যামার ভয়ানক ঝগড়া হইল। তাহার ফলে শ্যামা গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র আর এক কুটুম্বের রাড়ী গেলেন। সেখানেও তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। এমনি এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে দুঃখে-কষ্টে তিনি অনেক ভুগিলেন, শেষে তাঁহার মেয়ে দুইটি পর-পর ওলাউঠায় একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। তখন শ্যামা দেবী ভট্টাচার্য্যের কাছে অনেক মিনতি করিয়া কিছু টাকা ভিক্ষা করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

কলহপরায়ণা হইলেও শ্যামা যে সাধ্বী ও সেবা-নিপুণা ছিলেন, সেটা তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামবাসীদের মনের ভিতর গাঁথিয়া গেল। তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামে সকলেই অল্পবিস্তর ক্ষুব্ধ হইল। এ ব্যাপারের দায়িত্ব সকলে অকুণ্ঠিত চিত্তে দত্তগিন্নীর ঘাড়ে চাপাইল। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ও গ্রামবাসী-সকলের নির্ম্মমতার দায়িত্ব সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দত্তগিন্নীর চরিত্র-দোষরূপ মূল কারণটাকেই সকলে চাপিয়া ধরিল। যাহারা দত্ত-পরিবারের উপর ক্ষেপিয়া ছিল, তারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। একদল যুবক এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে, দত্তজার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পাপিষ্ঠাকে দগ্ধ করিবার সাধু সঙ্কল্পও তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। কথাটা তাহারা গোপন রাখিবার কোন চেষ্টা করে নাই, কাজেই গোপাল ভাণ্ডারী তাহা সহজেই জানিতে পারিল। সে অবিলম্বে প্রেসিডেণ্টের কাছে এত্তেলা দিল, দত্তবাড়ীতে সরকারী খরচায় চৌকীদার মোতায়েন হইল এবং কালক্রমে মহকুমার আদালতে বিচার হইয়া এক দল ছোকরা জামিন-মুচলেকায় আবদ্ধ হইয়া রহিল।

ইহাতে প্রধূমিত অগ্নি রীতিমত জ্বলিয়া উঠিল।

ইহার পরই চৌধুরী-বাড়ীতে কন্যার বিবাহে তিন-চার শত লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। সাবেক রীতি-অনুসারে দত্তগিন্নী ছেলেদের ভার গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে পরিপাটীরূপে রন্ধনাদি সম্পন্ন হইল। চৌধুরী বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান ভরিয়া লোকে পাত পাড়িয়া বসিয়া গেল।

বাড়ীর বউ-ঝিকে সঙ্গে লইয়া দত্তগৃহিনী পরিবেষণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পাঁচ-সাতটি ভদ্রলোকের পাতে নির্ব্বিবাদে ভাত দিয়া যাইবার পর দত্তগিন্নী ভবেশ রায়ের পাতে ভাত দিতেই সে "হাঁ, হাঁ" করিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভবেশ রায় বড় গলায় বলিল, "চৌধুরী মশায়, আমাদের জাত মারতে চান্ না কি? মেয়ের বিয়েতে পাঁচ গাঁয়ের স্বজাতি নিমন্ত্রণ করে এনে শেষে একটা বেশ্যা দিয়ে পরিবেষণ করাচ্ছেন!"

ইহার পর একটা ভীষণ হট্টগোল বাধিয়া গেল। সকলেই পাত ছাড়িয়া উঠিয়া তর্কাতর্কিতে যোগ দিল। ব্যাপারটায় মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া হইতে পারে না!

নটবর দাস কেবল চাপিয়া বসিয়া রহিল, সে বলিল, "অন্ন ব্রহ্ম, পরান্ন পরব্রহ্ম, ছেড়ো না বাবা, ছেড়ো না।" কিন্তু সে কথা কেহ কাণে তুলিল না।

চৌধুরী মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল। তর্কের মুখে এ কথা প্রকাশ হইতে বিলম্ব ঘটিল না যে, দত্তগিন্নী কেবল পরিবেষণ করিতে আসেন নাই, রান্নাটাও তাঁর স্বহস্ত-কৃত। কাজেই ভবেশ রায়ের কথাটা যদি টিঁকিয়া যায়, তবে তাঁর এত আয়োজন একেবারে মাটি হয়, তাই তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপাকে নিজের ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিয়া,

পাশের দাওয়ায় বসিয়া দেখা-শোনা করিতেছিলেন; তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া ভবেশকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তার দল ভারী, সেও সহজে হটিবার পাত্র নয়।

চৌধুরী মহাশয়ের বৈবাহিক ও সমস্ত বরযাত্রীর সম্মুখে সমস্ত দেশ-শুদ্ধ লোকের সামনে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। সকল পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া ভবেশ রায়ের দল দত্তগিন্নীর চরিত্রের স্বচ্ছন্দ সমালোচনা করিতে লাগিল।

দত্ত-মহাশয় ক্ষিপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী আঙ্গিনা হইতে একখণ্ড বাঁশ সংগ্রহ করিয়া ভবেশকে মারিতে ধাওয়া করিলেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে বউ-ঝিদের লইয়া দত্তগিন্নী কিছুক্ষণ ভাতের থালা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ঘোমটা অভ্যাসমত টানা ছিল, কিন্তু তাহার আড়ালে তাহার মুখের মাংসপেশী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার এবং এই সব ভদ্র যুবতী ও কিশোরীদের সম্মুখেই এমন অনেক রকম কথার আলোচনা হইতে লাগিল, যাহা ভদ্রলোকের ও ততোধিক ভদ্র-মহিলার অশ্রাব্য। ইঁহারা দাঁড়াইয়া শুনিলেন; বউগুলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। দত্তগিন্নীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কেবল একবার যখন ভবেশ রায় বড়গলায় বলিল যে, পাঁচি চাঁড়ালনীকে গোপাল ভাণ্ডারী নিজে দত্তগিন্নীর বাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছিল কেন? তখন দত্তগিন্নীর ওষ্ঠে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। চির-বন্ধ্যার নামে এ অভিযোগে তিনি একটু হাসি বোধ করিলেন। তার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেয়েদের সরিতে বলিলেন। সকলে বৈঠকখানায় উঠিয়া গেল! সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৈঠক চলিল।

দেখা গেল, দত্তমহাশয় ও দত্তগৃহিনীকে লইয়া বেশ দুইটা দল হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় দণ্ডদের দলে; আর ছোট-খাট যাহারা তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহাদের বিরুদ্ধে। গোপাল ভাণ্ডারীর কূটনীতি বিফলে যায় নাই।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর যখন কিছুই স্থির হইল না, তখন চৌধুরী মহাশয়ের নূতন বৈবাহিক মহাশয়ের হিসাবে স্থির হইল যে আপাততঃ দণ্ডগৃহিনীকে রান্নার ও পরিবেষণের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হইলে সকলে অন্নগ্রহণ করিবেন। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বৈঠক করিয়া দণ্ডিগিন্নীর চরিত্র সমালোচনা ও সেবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা যাইবে। এই সর্ত্তে আপোষ হইলে পর সকলে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত গিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন উদরসাৎ করিল। কেবল দুইজন লোক খাইতে অস্বীকার করিল, তাহাদিগকে কেহ গ্রাহ্যও করিল না।

পাণ লইবার সময় নটবর দাস ভবেশকে বলিল, "ভায়া, পেটে হাত দিয়া ভাল করে দেখ, জাতটা বেঁচে আছে তো!"

ভবেশের মেজাজের তপ্ত তেলে কে যেন একটা বেগুন ফেলিয়া দিল! সে তিড়িং-বিড়িং করিয়া উঠিল; নটবর তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "ক্ষেপো না ভাই! বেশ্যার অন্ন জিনিসটা বড় নাপাক, এতে করে উদরাময় হয়ে জাতটা মারা যেতে পারে, তাই বলছি!"

৯

দত্তদের একঘরে করিবার প্রস্তাব ফাঁসিয়া গেল। একঘরে করিবার প্রধান উপায় যে তিনটি,—দেখা গেল, তাহার দ্বারা শরৎ দত্তকে ঠেকানো কঠিন। ধোপা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চাকরাণভোগী প্রজা; সে বরং গ্রামের লোককে ভোগাইতে পারে, গ্রামের লোকের তার উপর কোনই হাত নাই। নাপিত কানাই কেবল যে শরৎ দত্তর সুহৃদ তা নয়, সে সান্যালদের প্রজা ও ভৃত্য, আর সান্যাল মহাশয় গোপালের হাতে। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তো শরৎ-দত্তর একান্ত পক্ষপাতী!

আর যা' উপায় আছে, তাহাতেও শরৎ দত্তকে স্পর্শ করা কঠিন দাঁড়াইল। শরৎ দত্তর মেয়ে নাই,—কাজেই সমাজের শাসন চালাইবার একটা প্রকাণ্ড সুযোগও নাই। মড়া না পুড়াইয়া শাসন তো আর তাহারা জীবিত থাকিতে করিবার উপায় নাই!

বাকী রহিল শরৎ দত্তকে লইয়া খাওয়া-দাওয়া না করা। সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে আটকাইলেও দত্তর তাহাতে বেশী ব্যস্ত হইবার কথা নয়, কেন না তাহারা স্বামী-স্ত্রী কেহই বড় মিশুক নয়, আর দশজনের সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করিতে না পারিলে যে তাহারা মুষ্‌ড়িয়া মরিয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই আটকাইবার কোন উপায় রহিল না। কেন না গ্রামের যাঁরা মাথা-মাথা লোক, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে দত্তদের পক্ষে দাঁড়াইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, চৌধুরী মহাশয় ইঁহারা সকলে বয়সেও প্রবীণ, অর্থ-প্রতিপত্তিতেও গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই তাঁহাদের আশ্রিত বা কৃপাধীন।

কাজেই ভবেশ রায় তার যৌবনসুলভ কর্ম্মতৎপরতার সহিত যতই কেন ছুটাছুটি করুক না, সে দত্তদের কিছুই করিতে পারিল না। উত্তে-

জনাটা যখন খুব বেশী প্রবল, ঠিক সেই সময় একদিন ভবেশের চেষ্টায় একটা বৈঠকে ঠিক হইয়া গেল যে দত্ত মহাশয়ের হুকা বন্ধ। ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মাতব্বর সেখানে কেহ ছিলেন না। ভবেশ ইহা লইয়া খুব হৈ-চৈ করিতে লাগিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও চৌধুরী মহাশয়কে হাতে পায়ে ধরিল, অপর লোককে ধমকাইল, শাসাইল। কিন্তু কিছুই হইল না। ভবেশ চটিয়া ক্রমে গ্রাম-শুদ্ধ সকলকেই একঘরে' করিয়া বসিল। তার দলে আর কেহ রহিল না, সেও কাহারও বাড়ী খাওয়া দাওয়া করিত না।

কয়েকদিন উত্তেজনার পর গ্রামবাসীরা দিব্য শান্ত সুস্থির হইয়া বসিল। দত্ত মহাশয় নিশ্চিন্ত মনে সকলের বৈঠকে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে লাগিলেন। দত্ত-গিন্নী মাথায় ঘোমটা টানিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইয়া মেয়ে-মজলিসে আদর সম্ভাষণ পাইতে লাগিল। তাহারা চক্ষের অন্তরাল হইলেই সকলে কাণা-ঘুষা করিত, হাসাহাসি করিত। আর দশজন অসতী মেয়ের মত দত্ত-গিন্নীও অন্তরঙ্গ বন্ধু-মহলে কেবল একটা আমোদজনক আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল। বুড়ারা মুচকি হাসিয়া দত্ত গিন্নীর সম্বন্ধে নূতন টাটকা খবর লইয়া মৃদুস্বরে আলোচনা করিতেন। ছোকরারা নিভৃতে সেই বিষয় লইয়াই কৌতুক করিত। গিন্নীরা রাইমণি ও পাঁচিকে ডাকিয়া দত্ত গিন্নীর সব গুহ্যতম খবর সংগ্রহ করিতেন, যুবতীর দল মজলিস করিয়া নানা আদিরসঘটিত আলোচনার মধ্যে দত্ত-গিন্নীর অপার কীর্ত্তি-কলাপের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্তি পাইত।

যতদিন বাহিরের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইয়াছিল, ততদিন দত্তজা একরকম আনন্দে ছিলেন। স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি আগ্রহের সহিত স্ত্রী ও গোপালের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন এবং ওকালতীর ঝোঁকে প্রায় নিজেও বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিলেন যে কৃপাময়ীর বাস্তবিক কোন দোষ

নাই, আর থাকিলেও তেমন দোষ গ্রামের প্রত্যেক নারীর আছে! এমন কি তিনি প্রায় বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিলেন যে সতীত্ব হিসাবে কৃপাময়ী সীতা সাবিত্রীর দলে না হইলেও, গ্রামের ঠাকরুণদের কয়েক ধাপ উপরেই। যাঁহারা সব চেয়ে বেশী সতীত্বের স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দত্তজা বেশী নিশ্চয়তার সহিত স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঠিক তার উল্টা। এই কথা ধ্যান করিয়া করিয়া তিনি শ্যামা ঠাকুরাণীর যৌবনকাল সম্বন্ধে কতকগুলি আশ্চর্য্য কাহিনী কল্পনা করিয়া সেগুলি শেষে বিশ্বাসের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। দুই-একজন তাহাতে তাঁহাকে থু থু করিয়াছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক শ্যামার সম্বন্ধেও এমন কথা শুনিয়া চট্ করিয়া বিশ্বাস করিল এবং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

যখন সকলেই এমন অসতী, তখন কৃপাময়ী এমন কিই বা করিয়াছে, যাহাতে তাহাকে বিশেষ ঘৃণা করা যায়—মনে মনে এই রকম সাব্যস্ত করিয়া দত্তজা অনেকটা আনন্দে ছিলেন। বিশেষ এই উপায়ে গোপালের বুদ্ধি ও শক্তির সহায়তা পাওয়াটাকে তিনি বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু গোলযোগ ও তাহার সঙ্গে ওকালতির প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া গেল, তখন দত্ত মহাশয়ের ভিতর সুপ্ত মনুষ্যত্ব আবার এক আধবার সামান্য একটু নড়াচড়া করিতে লাগিল। আর দত্তগিন্নী বাড়া-বাড়িটাও বড় বেশী আরম্ভ করিল। স্বামীর কাছে আগে যাও কিছু ঢাকাঢাকি ছিল, তাহা সে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিল। গোপাল যখন-তখন আসিতে লাগিল, আর সে আসিলেই দত্ত-গিন্নী সকল কাজ ফেলিয়া সোজা তাহার কাছে গিয়া হাজির হইত। দত্তজা হয়তো ঘরে বসিয়া কোন কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, কৃপাময়ী আসিয়া তাঁর কাগজপত্রগুলি উঠাইতে উঠাইতে অনায়াসে হুকুম করিত, "তুমি এখন একটু বাইরে যাও।"

প্রথম যেদিন এমনটা হইল, সেদিন দত্ত মহাশয়ের ভয়ানক মনে লাগিল ; কিন্তু ক্রমে ইহাও অভ্যস্ত হইয়া আসিল। তখন আর বলার দরকার হইত না, গোপালকে দেখিলেই দত্তজা বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেন। তার পর এক দিন তাহারা ঘরে আসিলে, দত্ত মহাশয়ের কাগজ পত্র গুছাইতে একটু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে গোপাল তাহার অস্তিত্ব একদম ভুলিয়া গিয়া, কৃপাময়ীকে একটা বিশ্রী পরিহাস করিয়া বসিল। কৃপাময়ীও হাসিয়া তার পাল্‌টা জবাব দিল।

দত্ত মহাশয় মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আছে ; তাহার তলায় বসিয়া দত্তজা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন। আজ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারও একেবারে অসহ্য ঠেকিয়াছে। এমন করিয়া ঘরে থাকার চেয়ে বিবাগী হয়ে যাওয়া ভাল। লোক সমাজে একটা কেলেঙ্কারী হইবে এই জন্যই তাঁর যা ভয়, আর সেই ভয়েই তাঁকে সব স’হয়া যাইতে হইতেছে। কেলেঙ্কারী যে আঠারো আনা পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, সেটা তিনি হিসাব করিলেন না। কেমন করিয়া লোকের কাছে কেলেঙ্কারী না করিয়া এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণবল শরৎ দত্ত কেবল তাহাই ভাবিয়া অধীর হইলেন।

খেয়া পার হইয়া কানাই নাপিত সেই সময় সান্নালবাড়ী হইতে ফিরিল।

দত্ত মহাশয়কে এমনি অবস্থায় দেখিয়া চতুর কানাই অনায়াসে বুঝিল যে, আজ একটা ভয়ানক কিছু হইয়াছে। সে দত্ত মহাশয়ের কাছে আসিয়া বসিল, আর ধীরে ধীরে তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া গেল। দত্ত মহাশয় অবশ্য সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি স্ত্রীর চরিত্রের উপর কোন দোষ নিক্ষেপ করিলেন না। তাঁর একমাত্র অভিযোগ এই যে স্ত্রী তাহাকে

সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। গোপনে গোপনে সে যে কি কারবার করিতেছে, তাহা দত্ত মহাশয় জানেন না, কিন্তু গোপাল ভাণ্ডারীর পরামর্শে সে তাঁহার টাকাগুলির সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। আর সে যে গোপনে ভাণ্ডারীকে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে, ইহাই দত্ত মহাশয়ের রাগের কারণ।

ইহা ছাড়াও, কানাই তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া এমন সব কথা জানিয়া লইল, যাহাতে সে আসল ব্যাপারের বেশ একটু আঁচ পাইল।

কানাই তাহাকে পরামর্শ দিল, স্ত্রীকে এতটা আস্কারা দিবেন না; তাকে এখনো শাসন করতে পারেন তো।

দত্তজা বলিলেন, "ভাল কথা বল্লে বাপু! সেই আমাকে চিরদিন শাসন করে এলো; আর আজ আমি তাকে শাসন করবো! একবার তোর কথা শুনে চেলা কাঠের বাড়ী পেয়েছি, আবার কি প্রাণে মারা যেতে বলিস্!"

কথাটা বলিয়াই দত্তজার আপশোষ হইল। তাঁহার বিশ্বাস যে দত্ত গৃহিনীর হাতে সেদিনকার লাঞ্ছনার কথাটা এতদিন গোপনেই আছে। সেই গোপন কথাটা ঝোঁকের মাথায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন।

কানাই বলিল, "কিন্তু শাসন করা তো সোজা দত্তমশায়। তার খোরাক তো আপনার হাতে।"

"আরে আমার জান যে তার হাতে। আমি যদি তার খোরাক বন্ধ করতে যাই, এক দিন যদি টাকা তার হাতে না দিই, তবে সে যে আমাকে সোজা খুন করে বসবে!"

কানাই বলিল, "তাই যদি ভয়, তবে তার সঙ্গে থাকেন কেন? আপনি কেন তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিন না! দেখি, সে কোথায় যায়!"

"হয়েছে! সে আমায় দিনে দুবার বাড়ী থেকে বের করছে, আর আমি তাকে বের করবো! ভায়া, বল্লেই হয় না, আমার স্ত্রীর মত মেয়ে মানুষের সঙ্গে কারবার করতে হোত, তবে বুঝতে পারতে ব্যাপারটা কি!"

কানাই বলিল, "আচ্ছা বসুন, একটা বুদ্ধি করেছি। আপনি তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছেন! আমি বলি, আর ঘরে ফিরবেন না। অন্য বাড়ী যান, চাই কি অন্য গাঁয়ে যান, ঘুরে ঘুরে বেড়ান, টাকা-কড়ি আদায় করুন, ওঁকে কিছু দেবেন না। তবেই জব্দ হয়ে কেঁদে পথ পাবেন না ঠাকরুণ!"

কথাটা দত্ত মহাশয়ের মনে লাগিল। তখন অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া দুজনে মিলিয়া বুদ্ধি আঁটা হইল। দত্ত মহাশয় পরের দিন প্রত্যূষে উঠিয়া রামগঞ্জে তাঁহার পিসতুত ভগ্নীর বাড়ী চলিয়া যাইবেন এবং আর কৃপাময়ীর ধার দিয়াও ভিড়িবেন না, ইহাই শেষে স্থির হইল।

আলোচনা করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাঁহারা এই আলোচনায় এত তন্ময় ছিলেন যে, গোপাল যে ইতিমধ্যে তাঁহাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহারও নজরে পড়ে নাই। গোপাল নীরবে দাঁড়াইয়া যখন ষড়যন্ত্রটা সমস্ত বুঝিতে পারিল, তখন নীরবে সরিয়া গেল।

দত্ত মহাশয় সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপচাপ বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী তখন বাড়ী নাই দেখিয়া তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করিলেন। নীরবে গিয়া সিন্দুক খুলিয়া তাঁহার কাগজ-পত্র ও টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একটা মোটা পুলিন্দা এক পাশে রাখা ছিল, তাহা পাইলেন না। সেইটা সব চেয়ে বেশী দরকারী। তাহার মধ্যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির নামজারীর কাগজ ও অন্যান্য দলিল ছিল। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন; শেষে কৃপাময়ীর সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত গুটাইয়া রাখিলেন।

অভ্যাসমত আধহাত ঘোমটা টানিয়া দত্ত-গিন্নি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "খেতে এসো।"

দত্ত মহাশয় গম্ভীরভাবে খাইতে গেলেন। খাইয়া দাইয়া ফিরিয়া আর একচোট সন্ধান চলিল, কাগজ পাওয়া গেল না।

অনেক রাত্রে গৃহিণী ঘরে আসিলেন। তাঁহার হাতে সেই হারানো পুলিন্দাটা। দত্ত গিন্নী ধীরভাবে পুলিন্দাটা এবং আর একখানা কাগজ সিন্ধুকের উপর রাখিয়া প্রদীপটা উস্কাইয়া দিলেন এবং পিলসুজটি ধরিয়া তুলিয়া দত্ত মহাশয়ের পাশে বিছানার উপর রাখিলেন।

তার পর ধীরে ধীরে গিয়া দোয়াত কলম এবং সিন্ধুকের উপর রাখা সেই কাগজখানা আনিলেন। দোয়াত কলম দত্ত মহাশয়ের হাতের কাছে রাখিয়া কাগজ-খানা দত্ত মহাশয়ের সামনে ধরিলেন এবং ধীরভাবে বলিলেন, "এইখানে সই কর।"

এতক্ষণ দত্ত মহাশয় অবাক্ হইয়া স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিলেন। এখন একেবারে বজ্রাহতের মত চাহিয়া দেখিলেন, কাগজখানা একখানা ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা দলিল। তাড়াতাড়ি তাহার উপর চক্ষু বুলাইয়া তিনি দেখিলেন যে ইহা একখানি দান-পত্র! ইহাতে লেখা আছে তিনি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী কৃপাময়ী দত্তকে দান করিতেছেন। দলিলের সঙ্গে রীতিমত সমস্ত সম্পত্তির তপশীল দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাপারটা এই :—

গোপাল ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া আসিয়াই দত্তগিন্নীকে পরামর্শ দিল যে আজ রাত্রের মধ্যে যদি সে একখানা দানপত্র না করাইয়া লইতে পারে, তবে হয় তো দত্তজা শিকল কাটিয়া পলাইবে! সে বলিল, তাহার কাছে ষ্ট্যাম্প কাগজ আছে, সে অবিলম্বে দলিল লিখিয়া দিবে। দলিলে সম্পত্তির

তপশীল লাগিবে বলিয়া সে দত্ত-গৃহিণীর নিকটে চাহিয়া দলিলের পুলিন্দা লইয়া গিয়া এতক্ষণ ধরিয়া দলিল লিখিয়াছে। দত্ত মহাশয় যতক্ষণ নিজের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন, ততক্ষণ গৃহিণী গোপালের বাড়ীতে বসিয়া দলিল লিখাইতেছিল। দলিল সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ, এমন কি লেখক ছাড়া তিনজন সাক্ষীর দস্তখতও তাহাতে দেওয়া রহিয়াছে, এখন দত্তজা সই করিলেই হয়!

দত্ত মহাশয় নিরুপায় ভাবে বলিলেন, "এ কি ?

"দেখতে পাচ্ছো না, একখানা দান-পত্র ? এখানা তোমায় সই করতে হবে।"

গৃহিণীর মূর্ত্তি দেখিয়া দত্তর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তবু নিমজ্জমান ব্যক্তির মত সমস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ কেন ?"

"ন্যাকা, জানেন না! তুমি আমায় ভাতে মেরে শাসন করতে চাও! এমন চিন্তা যাতে তোমার মনে আর কখনও না আসে, সেইজন্যে এই ব্যবস্থা।"

"তোমায় ভাতে মারবো ? সে কি কথা, কৃপা ?" বলিয়া দত্তজা একটু হাসিলেন।

কিন্তু কৃপাময়ীর তাহাতে কৃপা হইল না। সে বলিল, "হাঁ গো, হাঁ, কানাই নাপিতের সঙ্গে তোমার যে পরামর্শ হয়েছে, সব আমি জানি। আর ন্যাকামির দরকার নেই, সই করবে না কি, কর।"

মস্ত বড় হাঁ করিয়া দত্তজা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি সত্য সত্যই পরিপূর্ণরূপে অবাক হইয়া গেলেন। অবাক্ হইলেন কৃপাময়ীর প্রস্তাবের অপূর্ব্বতা দেখিয়া, অবাক্ হইলেন তাহার লোভের পরিণাম ও সাহস দেখিয়া, আর সব চেয়ে বেশী অবাক্ হইলেন এই নারীর সর্ব্বজ্ঞতায়!

যখন কানাইয়ের সঙ্গে দত্ত মহাশয় আলাপ করিতেছিলেন, তখন সেখানে অন্য কেহ ছিল না—এ কথা তিনি হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে কৃপাময়ী জানিল কি করিয়া? ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ইহার কোন ভৌতিক শক্তি নেই তো!

ভাবিতে দত্ত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এক দিন তিনি নিভৃতে দাঁড়াইয়া দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়াছিলেন। একজন বলিতেছিল, "দত্তজা যে কিছু না জানে, তা নয়। সে স্বচক্ষে সব দেখেছ, তবু সে যে স্ত্রীর কাছে এমন ভেড়া বনে রয়েছে কেন, তা বুঝতে পারি না।"

ইহার উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, এ সব মন্ত্রে-তন্ত্রে হয়। এমন একটা মন্ত্র-পড়া সিন্দুর পাওয়া যায়, যাহা মাথায় পরিলে স্ত্রী যাহাই করুক না কেন, স্বামী তার কাছে সম্পূর্ণ পদানত হইয়া থাকিবে। তা' ছাড়া, ডাকিনী-মন্ত্রে দীক্ষা থাকিলেও এ রকম করা যায় ইত্যাদি!

সেই কথা দত্তজার মনে উঠিল। তাঁর স্ত্রী কি সত্য সত্যই ডাকিনী মন্ত্রে সিদ্ধা না কি? যদি হয়, তবে কি ভয়ঙ্কর! দত্তজা কাঁপিতে লাগিলেন।

কৃপাময়ী বলিলেন, "হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি? যত বড়ই হাঁ কর, আমাকে আস্ত গিলতে পারবে না। সই করবে না কি, কর, নইলে—সেদিন গোপাল এসেছিল বলে বেঁচে গেছ, আজ আর জ্যান্ত থাকবে না।"

ইহার চেয়েও জবর ভয়ে দত্ত মহাশয় কম্পমান ছিলেন। মুখে কোন কথা বলিবার সাহস তাঁর কোন অবস্থাতেই হইত না, এখন মনেও স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন কথা ভাবিতে সাহস হইল না—এ নারী যে তাঁর মনের কথা সব দেখিতে পাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিমূঢ় থাকিয়া, দত্ত মহাশয় কম্পিত হস্তে কলম লইয়া বলিলেন, "কোথা সই করবো, বল ?"

কৃপাময়ী সকল স্থান দেখাইয়া দিল ; পাতায় পাতায় সহি করিয়া দত্ত মহাশয় গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় কলমটা ছুড়িয়া ফেলিলেন।

তার পর কৃপাময়ীর মুখের দিকে মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে হঠাৎ তার পায় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সব তো দিলাম তোমায়, আমার তো আর কোন জোর রইল না, এখন দয়া করে আমায় প্রাণে মেরো না।"

কৃপাময়ী দলিলখানা ভাঁজ করিতেছিল। সিন্ধুক খুলিয়া দলিল ও পুলিন্দা তাহার ভিতর বন্ধ করিল। ততক্ষণ দত্তজা তাহার পায়ের কাছেই পড়িয়া রহিলেন। সিন্ধুক বন্ধ করিয়া কৃপাময়ী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইল। একটু হাসিয়া বলিল, "না, এখন তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গা হলো, এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। খাও দাও হাসো খেলো, যা' ইচ্ছা কর, কেবল আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। কাল দলিলখানা রেজেষ্ট্রী করে দিয়ে এসে তার পর তুমিও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত।"

দত্তজার চক্ষু আবার গোলাকার হইয়া উঠিল। তাই তো, এখনো আপদ চোকে নাই—রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

পরের দিন দত্তজা ও গোপাল রেজেষ্ট্রী অফিসে গেলেন ; কৃপাময়ী ডুলি করিয়া সঙ্গে গেল ; কাজটা সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া সে স্বস্তি লাভ করিতেছিল না।

দত্ত মহাশয় আর গ্রামে ফিরিলেন না। কানাইয়ের উপদেশ মত তিনি রামগঞ্জেই গেলেন, কিন্তু সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তবে গেলেন। যখন গেলেন, তখন আর কৃপাময়ীর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজনই রহিল না।

গোপাল বেশ সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহিত সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিল ; কিন্তু অবস্থা-গতিকে সামান্য একটু গোলযোগ দাঁড়াইয়া গেল।

রামগঞ্জে গিয়া দত্ত মহাশয় ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কাছে সত্য-মিথ্যা নানা কথায় তাঁহার দুঃখ জানাইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, কৃপাময়ী রাত্রে গোপালকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। গভীর রাত্রে তিনি যখন ঘুমাইয়া ছিলেন, তখন কৃপাময়ী তার বুকের উপর চাপিয়া বসে, আর গোপাল একখানা ছোরা হাতে করিয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ কাবু করিয়া তাঁহাকে দিয়া তাহারা দলিল সহি করাইয়া লইয়াছে, আর ভোর না হইতেই তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া রেজেষ্ট্রী অফিসে লইয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহাকে এমন শাসাইয়াছিল যে, তিনি ভরসা করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। কোনও মতে দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া, তিনি প্রাণ লইয়া রাক্ষসী স্ত্রীর হাত হইতে পলাইয়াছেন ইত্যাদি।

রামগঞ্জের এক ভদ্রলোক হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল ছিলেন। তিনি এই সময় গ্রামে আসিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয়ের ভগ্নীপতি শ্যালককে তাঁহার কাছে লইয়া গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া উকীল মহাশয় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় ও উদ্যোগে দত্তজা অবিলম্বে জেলায় গিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিল।

রামগঞ্জে দত্ত মহাশয়ের কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তাহাদিগের নিকট কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া মকর্দ্দমার সূত্রপাত হইল।

গোপাল তো ইহাই চায়। সে প্রবল বেগে মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিল, অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। যে পরিমাণ খরচ হইল, তার

দশগুণ টাকা গেল গোপালের পেটে। কৃপাময়ীকে বাধ্য হইয়া সম্পত্তি রেহান দিয়া টাকা ধার করিতে হইল—সে বন্দোবস্তও গোপালই করিয়া দিল। সম্পত্তির স্বত্ব অনিশ্চিত বলিয়া রেহান দিয়া খুব বেশী টাকা উঠিল না। তখন কতক কতক সম্পত্তি বিক্রয় করা স্থির হইল। গোপাল সে বন্দোবস্তও করিয়া দিল।

পক্ষান্তরে দত্ত মহাশয়ও বিস্তর টাকা খরচ করিয়া মকর্দ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। তাঁর খরচ বে-হিসাবী কিছু হয় নাই, কিন্তু তবু তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি রেহান দিতে হইয়াছিল। ফলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়াই সমস্ত সম্পত্তি দুইবার করিয়া স্বতন্ত্র বন্ধকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

সব-জজ আদালতে দত্ত মহাশয় জিতিলেন। সে রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। গোপাল মহা-সমারোহে হাইকোর্টে যাত্রা করিল এবং দুই বৎসর ধরিয়া বার বার করিয়া কলিকাতায় গিয়া মকর্দ্দমার তদ্বির করিয়া এমন ব্যবস্থা করিল যে, কৃপাময়ীর সপক্ষে রায় প্রকাশ হইলে দেখা গেল যে, কৃপাময়ীর অর্দ্ধেকের বেশী সম্পত্তি বিক্রয় এবং অপরার্দ্ধ-সম্পূর্ণ মূল্যে রেহানাবদ্ধ হইয়াও, গোপালের কাছে কৃপাময়ী প্রায় হাজার টাকা পরিমাণে ঋণী হইয়া আছে।

ব্যাপার দেখিয়া কৃপাময়ী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে হিসাব-পত্র বুঝিত না, গোপালের উপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস তার স্খলিত হয় নাই, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া সে আকাশ হইতে পড়িল। সে দেখিল যে, গোপালের ঋণ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, তাহার পেট চলিবারও উপায় থাকিবে না। দত্ত-গিন্নী মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোপাল তখনও তাহাকে ভরসা দিতে লাগিল; বলিল, "এর এক

পয়সাও তোমায় দিতে হবে না। আমাদের ডিক্রীতে খরচাই তো প্রায় তিন হাজার টাকা পাওনা হয়েছে। তার পর দত্তজা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেছেন, তার ওয়াসিলাত দিতে হবে। পাঁচ সাত হাজার টাকা তার কাছে আছে, সে টাকা না নিঙড়ে নিয়ে ছাড়চি না।”

তাই গোপাল খরচার ডিক্রীজারির দরখাস্ত করিল। তাহা লইয়া কিছু দিন সদরে হাঁটাহাঁটি এবং পয়সার শ্রাদ্ধ হইল। তার পর দত্ত মহাশয়ের উপর জারী দিয়া মবলক একশত টাকা আদায় হইল। দত্ত মহাশয় একেবারে নিঃস্ব হইলেন।

গোপাল প্রথমে ফিরিয়া মুখভার করিয়া বলিল, “তাই তো, হতভাগা যে একেবারে ফতুর হয়ে গেছে, তা জানলে কে এ মকর্দ্দমা করতো! যাক, তার আর চারা নেই। কিন্তু আমার এ ছ’ হাজার টাকার কি ব্যবস্থা করা যায়? এ টাকা যদি আমার হতো, তবে তো কোন কথাই ছিল না,—তোমার টাকা যা, আমার টাকাও তাই। এ টাকা আমি সান্ন্যাল মশায়ের কাছে অনেক করে ধার নিয়েছি, সান্ন্যাল মশায় যে আমাকে উদ্বাস্ত করে তবে ছাড়বে।”

দত্ত-গিন্নী বলিল, “তাই তো, তবে উপায়?”

উপায় চট করিয়া গোপাল বলিল না। সে বলিল, “দেখি, একটু ভেবে দেখি।”

এদিকে হঠাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মারা গেলেন। ভবেশ রায় দত্ত-পরিবারের জন্য একা সমস্ত গ্রামকে এক-ঘরে করিয়া বসিয়াছিল। সে এই সুযোগে সে ঝাল ঝাড়িবার চেষ্টা করিল। আর তা ছাড়া, গ্রামের লোকের কাছেও ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকিল।

দত্ত-গিন্নী যত দিন দত্ত মহাশয়কে খাড়া রাখিয়াছিলেন, তত দিন তাহারা

ব্যাপারটাকে মোটের উপর কৌতুকের চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন সে দত্ত মহাশয়কে সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া উদ্বাস্ত করিয়া তাহাকে মামলা মকর্দ্দমায় জের-বার করিতে লাগিল, আর তার উপর ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়া নিজের বাড়ীর উপর গণিকার মত গোপালের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল, তখন সবারই অসহ্য হইয়া উঠিল।

গ্রামের লোকে এখন দত্তগিন্নীর উপর বেশ উৎপাত আরম্ভ করিল। নানারকম সামাজিক উৎপীড়ন দত্তগিন্নী নির্ব্বিবাদে সহ্য করিল। সে আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, আপনার ঘরে গৃহকর্ম্মে রত রহিল। তার পর তার বাড়ীতে ইট পাটকেল এবং ময়লা পড়িতে সুরু হইল। পথে ঘাটে তাহাকে ও গোপালকে সকলে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পরিশেষে এক দিন রাত্রে সত্য সত্যই দত্ত-গিন্নীর শয়ন-গৃহে তাহারা আগুন লাগাইয়া দিল।

গোপাল তখন সেই ঘরেই শুইয়া ছিল, সে তখনও ঘুমায় নাই। আগুন লাগাইবার পূর্ব্বেই সে লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া মৃদু পদক্ষেপে বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই কোণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে লোক বেড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। গোপাল তাড়াতাড়ি বেড়াটা টানিয়া ফেলিল। ততক্ষণে চালায় আগুন একটু ধরিয়া উঠিয়াছে। গোপাল অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত চালা হইতে দুই হাতে জ্বলন্ত খড় টানিয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিবাইয়া ফেলিল। ঘরের সে দিকটা একদম ফাঁক হইয়া রহিল।

ইহার পর গোপাল বলিল, "আমি বলি বউ ঠাকরুণ, চল, আমরা এ গ্রাম ছেড়ে যাই। সম্পত্তি যা' অবশিষ্ট আছে, বেচে কিনে চল দুজনে গিয়ে বৃন্দাবনে বাস করি গে। সেখানে বেশ শস্তায় থাকা যাবে, আর দেশের এ খেঁচাখেঁচি সেখানে পৌঁছুবে না।"

কৃপাময়ী বলিল, "তুমি যাবে কি? তোমার ঘর বাড়ী, আর ছেলে পিলে না হোক, তোমার স্ত্রী, তোমার ছোট ভাই—এদের সব ফেলে যাবে কি?"

"এতদিন পরে এই কথা বল্লে কৃপাময়ী! তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছুরই দরকার নেই। আমি শুধু চাই তোমাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে। স্ত্রী আছে, ভাই আছে, আমার জমি-জমা যা' আছে, দেশে থাক। তুমি আমি উধাও হয়ে বেরিয়ে পড়ি, চল।"

গোপালের এই স্বার্থত্যাগী প্রেমে দত্তগিন্নী অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেচে কিনে কি-ই বা থাকবে, তোমার টাকাই হয় তো হবে না।"

"এখনো তুমি আমার টাকায় তোমার টাকায় তফাৎ করছো? আচ্ছা, তবে এই নাও"—বলিয়া তাহার বরাবর কৃপাময়ী যে তমশুক লিখিয়া দিয়াছিল, সেখানা বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া কুচি-কুচি করিল।

অবাক্ বিস্ময়ে কৃপাময়ী চাহিয়া রহিল।

সমস্ত সম্পত্তি মায় বাস্তু ভিটা বিক্রয় করিয়া প্রায় আট হাজার টাকা হইল। ইহা করিতে কিছুদিন সময় গেল। তার পর গোপাল এক দিন দত্তগিন্নীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বৃন্দাবনে গিয়া তাহারা দুইজনে প্রায় এক বৎসর বাস করিল। টাকাটা গোপাল খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখিল। দত্তগিন্নীর নিজের সিন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাতে সে অত টাকা রাখিতে ভরসা করিল না। তাহার সঞ্চিত শ' তিনেক টাকা, আর হাজার খানেক টাকার গহনা তাহার নিজের সিন্দুকে ছিল।

এক দিন গোপাল দত্তগিন্নীর আঁচল খুলিয়া সিন্দুকের চাবি চুরি করিল। তার পর দত্তগিন্নীর সঙ্গে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া যখন কোথাও সে

চাবি পাইল না, তখন গোপাল বলিল, "তবে তো আর তোমার সিন্দুকে কিছু রাখা চলে না।"

কাজেই সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা এবং গহনা বাহির করিয়া গোপালের সিন্দুকে সে-সব রাখা হইল।

তার পর আর দত্তগিন্নী টাকা বা গহনার কোন খবর লওয়াও আবশ্যক বোধ করে নাই। ইত্যবসরে সেগুলি সমস্ত সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়া কলিকাতায় কোন ব্যাঙ্কের নামে হুণ্ডীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গোপালচন্দ্রের বুক পকেটে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ইহার পর একদিন গোপাল একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "বড় বিপদ, সান্যেল মশায় তাঁর টাকার দাবীতে আমার সম্পত্তি বাড়ী ঘর দোর সব ক্রোক্ করেছেন। একবার দেশে যেতে হচ্ছে, নইলে বউ আর ভাইগুলো সব না খেয়ে মারা যাবে। তুমি ক'টা দিন কষ্টে সৃষ্টে থাকো, আমি এলাম বলে।"

গোপাল চলিয়া আসিল। সিন্দুকের চাবি সে সঙ্গে লইয়াই আসিল। অনেক দিন দত্তগিন্নী তার প্রতীক্ষায় বিনিদ্র নয়নে শূন্য সিন্দুক পাহারা দিয়া কাটাইল।

গোপাল দেশে গিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। বিপদের পর বিপদে তাহাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সে গোলযোগ মিটাইয়াই আসিতেছে। মাস চারেক পরে কৃপাময়ী গোপালের ভাইয়ের নিকট হইতে পত্র পাইল, গোপাল হঠাৎ মারা গিয়াছে।

কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিয়া কৃপাময়ী কামার ডাকিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইল। শূন্য সিন্দুক দেখিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। এখন উপায় ?

উপায় ঠিক করিতে দত্তগিন্নীর বেশী বিলম্ব হইল না। গোবিন্দ-

জীর্ণ পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরের এক কোণায় এক বাঙ্গালী বাবাজী এক বিগ্রহ বসাইয়া যাত্রীদের নিকট বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন,—বাবাজীকে কৃপাময়ী অনেক দিনই দেখিয়াছে, আলাপ-সালাপও করিয়াছে। বাবাজীর চেহারা সুন্দর, তাঁহার বিগ্রহের বাবদে প্রাপ্তিও মন্দ নয়। কিন্তু উপস্থিত, বাবাজীর সেবা-দাসী নাই।

গোপালের অনুপস্থিতিতে কৃপাময়ী বাবাজীর আখড়ায় আগাগোনা করিয়াছে। সে এক রকম ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল যে, গোপাল যদি নাই আসে, তবে বাবাজীকেই তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া লইবে।

কাজেই এখন কৃপাময়ী ভেক লইয়া বাবাজীর সঙ্গে কণ্ঠীবদল করিয়া ফেলিল।

বাবাজীর সঙ্গে কিছু দিন মন্দ কাটিল না। বাবাজী রূপবান, তাঁর অবস্থাও স্বচ্ছল। কৃপাময়ী রূপসী নয়, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে সে এখনও অনেক কিশোরীকে হার মানাইতে পারে; আর, স্বভাব তার যতই বলিষ্ঠ ও প্রভুত্বপ্রিয় হউক, সাধারণতঃ বাহিরে সে বড়ই নরম ও নিরীহ। কথা সে বড় বেশী কয় না,—যা কয়, তাও মৃদুস্বরে। তা' ছাড়া, সে কর্ম্মঠ ও সেবাসৌষ্ঠবে অতুলনীয়। ইচ্ছা হইলে তাহার পক্ষে যে কোন পুরুষের প্রীতি আকর্ষণ করা কাজেই খুব কঠিন নয়।

কাজেই কিছু দিন মন্দ কাটিল না। কাজ-কর্ম্ম বিশেষ কিছু ছিল না। মন্দিরটা ঝাঁট-পাট দিয়া পরিষ্কার করা, ঠাকুরের সেবার আয়োজন করা, আর রান্না করা। তা' ছাড়া, বাবাজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত। কিন্তু প্রায়ই বাবাজী নিজে ভিক্ষায় বাহির হন্। কৃপাময়ীকে মন্দিরেই রাখিয়া যাইতেন। তখন যাত্রী আসিলে, কৃপাময়ীই তাহাদিগকে নির্ম্মাল্য চরণামৃত প্রভৃতি বিতরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত।

এ সমস্ত কার্য্যই সে এতটা সৌষ্ঠব ও নিপুণতার সহিত সম্পাদন

করিত যে, বাবাজী শীঘ্রই তার অত্যন্ত অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কৃপাময়ী বাবাজীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রীতি দেখিয়া আনন্দ বোধ করিল। সে নিজেকে আরও একাগ্রতার সহিত সেবায় নিযুক্ত করিল, আরও বেশী নম্র, আরও অবনত হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেখা গেল যে, বাবাজীর প্রেম যতই প্রবল হউক, টাকা-পয়সার উপর তাঁর আকর্ষণ তার চেয়ে অনেক বেশী। বাবাজীর রোজগার নেহাৎ মন্দ ছিল না, কিন্তু যথার্থ বৈরাগীর মত তিনি "ডোর কৌপীন" বই কোন কিছুতেই অর্থ ব্যয় করিতেন না; এবং নিতান্ত অবৈরাগীর মত সকলই সঞ্চয় করিতেন। কোথায় যে তিনি সঞ্চিত অর্থ রাখেন, সে কথা কৃপাময়ী কিছুতেই জানিতে পারিল না। বাবাজীর অর্থের প্রতি তীব্র দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়তা ছিল, তাহা কৃপাময়ী শীঘ্রই টের পাইল। বাবাজীর অনুপস্থিতিতে মন্দিরে যাহা কিছু প্রাপ্তি হইত, তাহা গোপনে হস্তগত করিবার দুই একটা চেষ্টা করিয়া কৃপাময়ী হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। বাবাজী এ বিষয়ে বিষম শক্ত।

কাজেই কয়েক মাস থাকিয়া কৃপাময়ী হাঁফাইয়া উঠিল। এমন করিয়া কয় দিন থাকা যায়! মোটা ভাত খাইয়া আর একখানা যেমন তেমন বস্ত্র পরিয়া দিন কাটাইবার মত মেজাজ কৃপাময়ীর ছিল না। তা ছাড়া, সে চির-দিন দত্তজাকে শাসন করিয়া আসিয়াছে। এখন সে দেখিতে পাইল, বাবাজী অতি সহজে তাহার উপর দিব্য প্রভুত্ব করিতেছেন। সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে কেবল মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়া তার অতীত গৌরবের কথা ভাবিত,—অনুগত স্বামীর কথা, তার সম্পদের কথা, গোপালের কথা, নিজের অতিলোভের কথা, গোপালের বঞ্চনার কথা, আর তার হঠাৎ মৃত্যুর কথা ভাবিত। ভাবিত আর ভবিষ্যৎ সুযোগের আশায় নীরস বর্ত্তমানকে কোন মতে সহিয়া যাইত।

একদিন মন্দিরে আসিল একদল যাত্রী। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া কৃপাময়ী সরিয়া গেল। তার পর পথে তাহাদের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিল। ইহারা দেশের লোক। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কৃপাময়ী জানিতে পারিল, গোপাল মরে নাই, কেবল তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। সেই যাত্রীদলের সঙ্গেই দত্তগিন্নী দেশে ফিরিল।

বলা বাহুল্য, গোপালের মৃত্যুর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কৃপাময়ীকে দিয়া তাহার যা প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। এখন দত্তজার সমস্ত সম্পত্তি এবং কৃপাময়ীর নিজস্ব সব স্ত্রীধন তাহার হস্তগত হইয়াছে। যাহা সে বেনামীতে কিনিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা বেনামদারদের নিকট হইতে নাদাবীপত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে তাহাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল। দখল সে বরাবরই রাখিয়াছিল। এখন সে গাঁয়ের দশের একজন। দত্তমহাশয়ের পরিত্যক্ত ভিটায় টিনের ঘর উঠাইয়া একটা পাকা বাড়ী গাঁথিতে আরম্ভ করিল। তাহার বন্ধ্যা পত্নীকে তাড়াইয়া দিয়া সে দ্বিতীয় সংসার করিল। এ মেয়েটি খাঁটি ঘোষ-বংশীয়।

ইতিমধ্যে দত্ত মহাশয়ের পক্ষে তাঁহার উৎসাহদাতা হাইকোর্টের উকীল-বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিলাতে আপীল দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। সে আপীলের খবর দত্ত গৃহিণীর পক্ষের উকীল পাইয়া দত্তগিন্নীর নামে বহু পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন; গোপালকেও দুই একবার লিখিয়াছিলেন। তাহারা তখন বৃন্দাবনে। ঘটনাচক্রে এ সব পত্র তাহাদের কাছে পৌছায় নাই।

বিলাতে তিন বৎসর পরে আপীলের শুনানী হইয়া একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল, দত্তমহাশয়ের দানপত্র অসিদ্ধ সাব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্বত্ব-দখল প্রতিষ্ঠিত হইল।

হঠাৎ এই সংবাদ শুনিয়া দত্তমহাশয় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আপীলের খরচ তিনি দেন নাই, তাহা চালাইয়াছিলেন তাঁহার উকীল, তাই দত্তজা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না।

গোপাল সংবাদ শুনিয়া বজ্রাহত হইল। সে কলিকাতায় তখনি ছুটিয়া গেল। জানিতে পারিল, প্রায় তিন চার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে, বিলাতে ছানি করা যাইতে পারে। ছানি করিলে যে বিশেষ ফল হইবে, এ আশ্বাস তাহাকে কেহ দিল না।

যথাসময়ে দত্তমহাশয় ডিক্রীজারী করিয়া নিজের সমস্ত সম্পত্তিতে পুনরায় দখল লইলেন, গোপালকে লাঙ্গুল গুটাইয়া তাহার বিবরে আশ্রয় লইতে হইল।

গোপালের পাকাবাড়ী প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, দত্ত মহাশয় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিতে লাগিলেন। গোপাল ইটকাঠের জন্য আদালতে নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইল, কিন্তু এবারে গ্রামবাসীরা তাহাকে রীতিমত শাসন করিল, সান্ন্যাল মহাশয়ও তাহাকে সাহায্য করিলেন না। কাজেই সে আপাততঃ কিলচুরি করিয়া রহিল।

দত্ত মহাশয় সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন, এবং তার উপর ফাও-স্বরূপ একখানা পাকাঘর ওয়াসিলাত স্বরূপ পাইলেন। কিন্তু চারিদিক হইতে তাঁহার পাওনাদারেরা আসিয়া তাঁহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। সকলের পরামর্শে তিনি গোপালের বিরুদ্ধে একটা ওয়াসিলাতের মকর্দ্দমা করিলেন। সেই বাবদে গোপালের সম্পত্তি বাড়ী ঘর তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া হাজার দুই টাকা আদায় করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঋণ সামান্যই শোধ হইল। বাকী ঋণের জন্য তাঁহার অর্দ্ধেকের উপর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। রহিল কেবল ভদ্রাসন ও পাঁচশত টাকা মুনাফার সম্পত্তি ও দুই হাজার টাকা ঋণ।

কিন্তু শীঘ্রই দত্তমহাশয় এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, এই বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবে কে? যত দিন দত্তগিন্নী ঘরে ছিলেন, তত দিন এ প্রশ্ন তিনি মনেও ভাবিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু এখন তাঁহার বংশরক্ষার প্রয়োজনটা ভয়ানক তীব্র হইয়া উঠিল।

সুতরাং বিবাহের আয়োজন হইল। গ্রামের লোকে উৎসাহের সহিত তাঁহার সহায়তা করিল। নানা স্থানে মেয়ের সন্ধান হইতে লাগিল। দত্তজার বয়স এবং তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস এবং তদুপরি সম্পত্তির স্বল্পতা প্রভৃতি হেতুতে অনেক স্থলেই কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু এক দুঃস্থ পিতা কোনও মতে কন্যা-বলির সুব্যবস্থা করিতে না পারিয়া, এবং দত্ত মহাশয়ের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত হইয়া, নিজের বিংশ-বর্ষীয়া কন্যাকে দত্তমহাশয়ের ঘাড়ে চাপাইতে সম্মত হইলেন।

উভয় পক্ষেই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার জন্য খুব আগ্রহ দেখা গেল। দত্তজা ভাবিলেন যে, অনেক খুঁজিয়া যদি বা একটা মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, এটা হাত-ছাড়া না হইয়া যায়। মেয়ের পক্ষ ভাবিল, অবশেষে বিনা পয়সায় মেয়ে পার করিবার এমন সুযোগ যদি ঘটিল, তবে সেটা কোন মতে না ফস্কিয়া যায়! কাজেই পঞ্জিকার সমস্ত বাধা এক "অরক্ষণীয়ার" জোরে কাটাইয়া, সপ্তাহ-মধ্যে ভাদ্র মাসেই দিন স্থির করা হইল। কন্যাপক্ষ মেয়ে তুলিয়া আনিয়া বিবাহ দিবেন।

একদিন ভোর বেলায় গোপাল খেয়াঘাটে পার হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। নৌকা ভিড়িলে সে সেদিকে অগ্রসর হইল। পর মুহূর্ত্তে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, এবং চট্ করিয়া ঘুরিয়া চোঁচা দৌড় মারিল। তাহার পর আর কেহ তাহাকে গ্রামে দেখে নাই।

সেই খেয়ায় পার হইয়া আসিল একখানা ডুলির মধ্যে একটি মেয়ে এবং তাহার বাপ। আর সেই সঙ্গে নামিল একটি বৈষ্ণবী। মেয়ে লইয়া তাহার পিতা নদীর ধারে নটবর দাসের বাড়ী গিয়া উঠিল, বৈষ্ণবী ঘোমটা টানিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার নূতন পাকা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় বৈষ্ণবী আসিয়া ধীরে ধীরে মাথার ঘোমটা একটু

টানিয়া তুলিয়া সেই ঘরের দিকে উঠিয়া আসিল। দত্ত মহাশয় মুখ চোখ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দত্ত মহাশয়কে কোন কথা না বলিয়াই বৈষ্ণবী ওরফে দত্তগিন্নী ঘরে ঢুকিল। একবার চারিদিকে সে চাহিয়া দেখিল। একখানা তক্তাপোষের উপর কয়েকখানা নূতন তাঁতে বোনা শাড়ী নববধুর জন্য রাখা ছিল। গেরুয়া কাপড় ছাড়িয়া তাহার একখানা লইয়া সে পরিল। বলা বাহুল্য, এই স্বচ্ছ বস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার সুগঠিত দেহ সম্যক রূপে প্রকাশিত হইল। চুলটা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া সিন্দূরের টিপ কাটিয়া ও সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া সে স্তব্ধ ভীত বিমূঢ় দত্ত মহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "কি, বিয়ের আয়োজন হচ্ছে যে ?"

দত্ত মহাশয় নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই কি—?"

দত্তগিন্নী আরও কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "সে সব হবে না, ওদের বিদায় করে দাও।"

দত্তজা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। গিন্নী তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল, আর সেখানে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল।

দত্তজা একেবারে গলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান বর-কর্ত্তা, কানাই ও পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া তাগাদা করিলেন যে, বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের ও গন্ধ পাঠাইবার আয়োজন করিতে হইবে।

দত্তজা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশায়, একটু বিঘ্ন ঘটেছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কি রকম বিঘ্ন ?"

দত্তজা। আজ বোধ হয় বিয়ে হতে পারবে না।

চক্রবর্ত্তী। আরে রাম বল, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহে আবার বিঘ্ন কি? হতেই পারে না। এ সব বাজে কথা। ভাল কথা, কয়েক জন এয়ো যে এখনি চাই। কানাই, যা তো, ভবির মা আর কুসুমকে ডেকে নিয়ে আয়।

একখানা সম্মার্জ্জনী হস্তে দত্তগিন্নী বাহির হইয়া বলিল, "দরকার হবে না চক্রবর্ত্তী মশায়, আমি এয়ো আছি। নতুন বউকে আর আপনাদের সবাইকে অভ্যর্থনার আয়োজনও করে রেখেছি।" বলিয়া ঝাঁটা গাছটা উঠাইল। "এখন বিদায় হোন্।"

কানাই কট্‌মট দৃষ্টিতে চাহিল; দত্তজা কাতর নয়নে চাহিলেন; চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া শেষে বলিলেন, "তাই তো বউ মা, তাই তো—তা' চল কানাই, একবার চৌধুরী বাড়ী"—বলিতে বলিতে কানাইকে এক রকম ঠেলিয়া লইয়া তিনি বাহির হইলেন।

গ্রামে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল বাধিয়া গেল। দত্তজাকে বার বার সকলে ডাকিয়া পাঠাইল। দত্তগিন্নী তাঁহাকে যাইতে দিল না। শেষে সকলে দল বাঁধিয়া দত্তজার কাছে আসিল। ঘোর তর্ক হইল। দত্তগিন্নীর যদিও স্বল্পভাষিণী বলিয়া খ্যাতি ছিল, তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি দত্তজাকে পিছনে ঠেলিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে সকলের সঙ্গে একা যে বাক্‌যুদ্ধটা করিলেন, তাহা ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা।

একজন যুবক বলিল, "হাঁ দত্তজা, আপনি না বংশ-রক্ষার জন্য বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন?"

নটবর দত্ত বলিলেন, "তা দোষটা কি হয়েছে? বংশ বল, দণ্ড বল, দড়ি বল, কলসী বল, একা দত্ত-গিন্নীই যে ওঁর সব।"

শরৎ দত্তকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার পক্ষপাতী লোক বেশী ছিল না। কেন না, হউক পরের মেয়ে, দত্তগিন্নী যখন আবার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছে, তখন তাহার সতীন করিয়া নিরপরাধ মেয়েটির নিশ্চয় মৃত্যু কেহ কামনা করিতে পারিল না। কিন্তু ভদ্রলোকের জাত-রক্ষার উপায় কি? গ্রামের মধ্যে বিবাহের যোগ্য দুই-একটি যুবক ছিল, আর তা' ছাড়া মৃতদারও দুই একজন ছিলেন। স্থির হইল যে মেয়েটী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া তাঁহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে হইবে। সংকল্পিত বরেরা সকলেই প্রবল বেগে এই রকম ঘাড়ে-পড়া মেয়ে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন। যাহা হউক গ্রামবাসীরা সবাই মিলিয়া মেয়েটিকে দেখিতে চলিলেন।

মেয়েকে সাজাইয়া সভার মধ্যে উপস্থিত করা হইল। দিব্য মেয়েটি। সে ফরসা নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীতে তার অনাড়ম্বর দেহখানি ভরিয়া রহিয়াছে। ঈষৎ ভীত, ঈষৎ ক্ষুব্ধ, ঈষৎ লজ্জিত, অথচ দৃঢ়, চঞ্চল দৃষ্টি এক মুহুর্ত্তের মধ্যেই সভাকে অভিভূত করিল। তখন যুবক ও মৃতদারদিগের মধ্যে এক রকম কাড়া-কাড়ি লাগিয়া গেল। দেখা গেল, এই ভদ্র লোকটিকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত।

সেই রাত্রেই বিবাহ হইয়া গেল।

দত্ত-গিন্নী পুর্ব্বের মত নির্ব্বিকার চিত্তে সংসার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এবার দত্তজাকে কয়েক বৎসর একঘরে হইয়া থাকিতে হইল।

যোগী

১

দোজবরে শরৎ দত্তের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য বিরজাকে তার বাপ বাঁশবন গ্রামে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দত্ত মহাশয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আবির্ভূত হইয়া বিবাহ ফাঁসাইয়া দিলে, গ্রামবাসীদের আয়োজনে বিরজার বিবাহ হইয়া গেল প্রাণকুমারের সঙ্গে।

ইহাতে সকলেই খুব খুসী হইল। গ্রামবাসীরা খুসী হইল একটা মস্ত সৎকার্য্য হইয়া গেল বলিয়া। বিরজার বাপ খুসী হইলেন মেয়েটা পার হইল এবং শরৎদত্তের মত ঘাটের মড়ার হাতে না পড়িয়া প্রাণকুমারের মত সুন্দর যুবকের হাতে পড়িল। প্রাণকুমার খুসী হইল রূপসী বধূ পাইয়া। বিরজা এতদিন শরৎদত্তের নানা বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, শেষে হঠাৎ তার পরিবর্ত্তে কার্ত্তিকের মত ফুট-ফুটে সুন্দর বরটি পাইয়া তো একেবারে নাচিয়া উঠিল।

বিরজার বিবাহিত জীবনের দুই বৎসর একটা আনন্দ-স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে দ্বিতীয় কন্যার আবির্ভাবে সে স্বর্গে একটু ছায়াপাত হইল। ক্রমে সে ছায়া গভীরতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রাণকুমারের বলিতে গেলে, এক সময় চালচুলা কিছুই ছিল না। পৈতৃক একটা ভিটা ছিল, তাহাতে ঘর ছিল না। কয়েকখানি জোত ছিল, তাহা তাহার পিতা পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দায়শোধি বন্ধক দিয়া

গিয়াছিলেন। কিছু তালুক ছিল, তাহা পিতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তার এক সম্পদ ছিল— তাহার রূপ ও তার সুকণ্ঠ।

কাওরাইলের জমীদার ব্রজেন্দ্র বাবুর পিতারা ছিলেন পাঁচ ভাই। ব্রজেন্দ্রবাবুরা ছিলেন চার ভাই। সুতরাং ব্রজেন্দ্রবাবুর সম্পত্তি ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার এক পরগণার বিশ ভাগের এক ভাগ। সম্পত্তির ছাহাম বাটওয়ারা হয় নাই। কিন্তু অংশীদারেরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র তহশীল করিতেন। কাজেই ব্রজেন্দ্রবাবুর এই সামান্য মুনাফার সম্পত্তি রক্ষার জন্য পাঁচটা কাছারী ছিল এবং সদরেও তাঁর একটা কাছারী ছিল, তাহা দেওয়ান, সদর নায়েব, সুমারনবিশ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মচারীতে ভর্ত্তি ছিল। তবে সুবিধার বিষয় এই যে, ব্রজেন্দ্রবাবু কর্ম্মচারীদের কাহাকেও দশ টাকার অধিক বেতন দিতেন না, মফঃস্বল কাছারীতে কর্ম্মচারীর বরাদ্দ ছিল পাঁচ টাকা। অবশিষ্ট তাহারা প্রজার নিকট যেন তেন প্রকারেণ আদায় করিয়া লইত।

এত বড় সম্পত্তির মালিক, কাজেই ব্রজেন্দ্র ভারি চালে থাকে। তার পিতা পঞ্চাশ হাজারী চাল ষোল আনা বজায় রাখিয়া কিছু দেনা-পত্র করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রও কোনও বিষয়ে চাল কমাইয়া স্বর্গীয় কর্ত্তাদের অসম্মান করা সঙ্গত মনে করে নাই। তার উপর সম্পত্তি পাওয়ার পর তার বাতিক চাপিল থিয়েটার করা। সে নিজে সুন্দর অভিনয় করিত, আর সমস্ত দেশ খুঁজিয়া ভাল ভাল অভিনেতা জোগাড় করিয়া সে একটা সুন্দর সখের নাট্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিল।

প্রাণকুমারের বাপ বাঁচিয়া থাকিতেই, সে স্কুল পলাইয়া নাটক করিতে আরম্ভ করে। স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয়ের জন্য তার তুল্য অভিনেতা

এ অঞ্চলে ছিল না। কাজেই তার ভারি আদর হইল। তাহাকে লইয়া এ তল্লাটে চারিদিকে মহা টানাটানি লাগিয়া গেল। ব্রজেন্দ্র তাহাকে বেতন দিয়া, অশন বসন দিয়া, নিজের কাছে রাখিত, তার দলে প্রাণকুমার অভিনয় করিত। তাহা ছাড়া নানা স্থানে লোকে তাহাকে পয়সাকড়ি দিয়া এক আধ রাত্রি অভিনয়ের জন্য লইয়া যাইত। যেমন ছিল তার নারীর মত কোমল কান্তি, তেমনি ছিল তার নারীর মত মধুর সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতে অসামান্য অধিকার।

কিছুদিন এমনি বেশ সুখে কাটিল। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে বিদায় লইয়া গিয়া প্রায় আট বৎসর প্রাণকুমার এমনি করিয়া কাটাইল। ইতিমধ্যে তার পিতা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফৌত হইলেন, এবং অযত্নে তাহার ভিটায় যে ঘর দুইখানি ছিল তাহাও পড়িয়া গেল।

পরে শোনা গেল যে, ব্রজেন্দ্রের অবস্থা সঙ্গীন। তার দেনার অবস্থা এত ভীষণ যে, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াও পাওনাদারদের টাকায় আট আনার বেশী আদায় হইবার সম্ভাবনা অল্প। এদিককার অবস্থা মন্দ দেখিয়া সে হঠাৎ বড়লোক হইবার আশায় পাটের ব্যবসায়ে অনেকগুলি টাকা ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশের পরিসমাপ্তি হইল। তাহার সমস্ত জমিদারী এক লাটে বিক্রয় হইয়া গেল। শেষে এক পাওনাদার তাহার অস্থাবর ক্রোক করিল, আর একজন তাহার নামে body warrant বাহির করিল, এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে বঞ্চনার অপরাধে ফৌজদারী করিয়া কয়েদ করিল।

যেদিন অস্থাবর ক্রোকের আদেশ হইল, সেদিন ব্রজেন্দ্রের সদর নায়েব ভাগ্যক্রমে আদালতেই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ নেজারতে গিয়া তাহার থলি ঝাড়িয়া দিয়া ক্রোকী পরওয়ানা জারী করিতে বিলম্বের ব্যবস্থা করিয়া

বাই-সিকেলে ছুটিয়া কাওরাইল উপস্থিত হইল। তাঁর পরামর্শে সেরাত্রি রাত্রির ভিতরে ব্রজেন্দ্রের স্ত্রীর গহনা ছাড়া অন্য সব দামী অস্থাবর সম্পত্তি তার বন্ধু বান্ধব ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেকে যে যার অংশ লইয়া নিজের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিতে গেল। এমন ভাবেই তাহারা লুকাইয়া রাখিল যে, বৎসর খানেক বাদে দেউলিয়া হইয়া জেল হইতে ফিরিয়া ব্রজেন্দ্র তাহার এক পয়সাও খুঁজিয়া পায় নাই। এমন ভাবে জিনিস্ পত্র সরান হইল যে, আদালতের পেয়াদা পর দিন আসিয়া সামান্য কয়েকটা টেবিল চেয়ার ও তক্তপোষ ছাড়া আর কোনও অস্থাবরই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তার সঙ্গে বডি-ওয়ারাণ্ট ছিল, সে ব্রজেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিল। দেখিতে দেখিতে সব-ইনস্পেক্টর বাবু ফৌজদারী কোর্টের ওয়ারাণ্ট আনিয়া উপস্থিত করিলেন, ব্রজেন্দ্র শ্রীঘরে যাত্রা করিল।

ব্রজেন্দ্রের অস্থাবর লুটের মধ্যে প্রাণকুমারের ভাগে পড়িয়া ছিল কতক কাঁচা টাকা, থিয়েটারের পোষাক, গোটা তিনেক ঘড়ি আর কয়েকখানা রূপার তৈজস পত্র। ব্রজেন্দ্রের যখন জেল হইল এবং তাহাকে দেউলিয়া সাব্যস্ত করিয়া হুকুম বাহির হইয়া গেল, তখন প্রাণকুমার তাহার সমস্ত মাল পত্র লইয়া কলিকাতায় গিয়া নির্ব্বিবাদে বিক্রয় করিয়া খরচ খরচা বাদে মবলক দুই হাজার টাকা লইয়া দেশে ফিরিল। পৈতৃক ভদ্রাসনে সে প্রায় হাজার টাকা খরচ করিয়া ভাল করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিল, এবং হাজার টাকার বিপুল সম্পদ পাইয়া বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মনের আনন্দে স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ব্রজেন্দ্রের সাহচর্য্যে বিশ বছর বয়সেই মদ এবং গাঁজায় তাহার সমান অধিকার জন্মিয়াছিল এবং পরদার বা বেশ্যা সম্বন্ধে তার কোনও রকম প্রেজুডিস ছিল না।

এই স্ফূর্ত্তির ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে ঘটনাচক্রে তাহার বিবাহ হইয়া গেল

এ অ- বিরজার সঙ্গে। তখনও তার হাতে প্রায় পাঁচশত টাকা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু লোকে জানিত যে ব্রজেন্দ্রের ভাণ্ডার লুটিয়া সে দশ বিশ হাজার টাকা মারিয়া আসিয়াছে। তাই বিবাহের পর প্রথম দুই বৎসর পর্য্যন্ত তার বা স্ত্রীর আনন্দের কোনও অভাব হয় নাই। বরং বিবাহ হইবা মাত্র তার চরিত্র হঠাৎ একদম শুধরাইয়া গেল। সে তার সুন্দরী স্ত্রীকে ছাড়িয়া কোথাও দুদণ্ড থাকিতে ভরসা পায় না। মদে বা গাঁজায় পয়সা নষ্ট করা সে বন্ধ করিয়া দিল, এবং আবশ্যক সংসার খরচে যথা সম্ভব কম খরচ করিতে লাগিল।

বিবাহিত হইয়া পাঁচশত টাকায় যে খুব বেশী দিন চলে না, এ কথা সে বুঝিতে পারিল! কাজেই বিবাহের পর হইতেই সে চারিদিকে চাকরী-বাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল! কিন্তু তাহার যে বিদ্যাবুদ্ধি, আর স্বভাব চরিত্রের যে খ্যাতি তার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছিল, তাহাতে চাকরী জোটান তার পক্ষে সহজ হইল না।

কিন্তু লোকের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবার জন্যই যাহাদের জন্ম, তাহাদের প্রায়ই কাঁটালেরও অভাব হয় না, আর কাঁটাল ভাঙ্গিবার জন্য মাথাও জুটিয়া যায়। এবারে মাথা পাতিলেন একটি মস্ত বড় জমীদার। তিনি একটা প্রকাণ্ড পাকা ষ্টেজ বাঁধিয়া নাটক করিতে লাগিলেন; প্রাণকুমারকে তিনি আদর করিয়া পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। দিন বেশ চলিতে লাগিল। এ উপলক্ষে সপ্তাহে প্রায় চার পাঁচ দিন তাহার গ্রাম ছাড়িয়া থাকিতে হইত। প্রাণকুমারের জ্যাঠতুত ভাইয়ের এক বিধবা স্ত্রী তাহার পাশের বাড়ীতেই একখানা ঘরে থাকিত, বিরজা রাত্রে তার কাছে গিয়া শুইত এবং দিনে নিজের বাড়ীতে থাকিত।

গ্রামের অনেকের নজর বিরজার উপর ছিল, সুযোগ পাইয়া তাঁহারা

একটু কাছাকাছি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিন পুকুর ঘাটে বিরজা সন্ধ্যাবেলায় গা ধুইতে গিয়াছে, সুরসিক নটবর সেখানে গিয়া তার সঙ্গে নির্জ্জনে এমন রসিকতা আরম্ভ করিল যে, বিরজার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। নটবর প্রাণকুমারের ঠাকুর্দ্দা হয়; কিন্তু তার বয়স মাত্র বছর চল্লিশেক, আর তার রসের জোরে সে নিজেকে তার চেয়েও ছোট করিয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর্দ্দা সম্পর্কের জোরে নটবর বিরজার সঙ্গে কথা কয়, হাসি তামাসা করে, বিরজা তাহাতে কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু ভয়ে তার প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে—নটবরের চোখের ভিতর সে রসিকতার চেয়ে অনেক গভীর জিনিস দেখিতে পায়। তাই অল্প অল্প কথা কহিয়া সিক্ত বসনে রূপের রাশি অতি অপ্রচুর ভাবে আবৃত করিয়া, তার আবরণের অভাবটা দারুণ লজ্জার সহিত অনুভব করিয়া চারিদিক দিয়া কাপড় টানিতে টানিতে মুখ নীচু করিয়া বিরজা ছুট দিল। নটবর তার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু বাঁশের ঝোপের আড়ালে হঠাৎ কিসের শব্দ পাইয়া চকিতে সে হাত ছাড়িয়া দিল। সেই অবসরে বিরজা ছুটিয়া পলাইল।

প্রাণকুমার ফিরিয়া আসিলে বিরজা তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল, 'এর প্রতিকার ক'রতে হ'বে।'

প্রাণকুমার মাথায় হাত দিয়া বসিল। নটবর দাস গ্রামের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক। তার রসিকতার জোরে গ্রামের প্রধান বড় লোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই সে বশ করিয়া রাখিয়াছে। অপর পক্ষে প্রাণকুমারের প্রতিপত্তি কিছুই নাই। নটবরের কুকীর্ত্তি লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিলে তার নিজের যে কত কুকীর্ত্তি লইয়া ঘাঁটাঘাটি হইবে কে জানে। এই বয়সেই অপকর্ম্ম তো সে বড় কম করে নাই। তার মনে পড়িল, ওই নটবরেরই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সে এমনি করিয়া পুকুর ঘাটেই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। সে কথা গ্রামের সকলেই কেমন

করিয়া যেন জানিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহা অপেক্ষা বড় অপকীর্ত্তিও যে না আছে তাহা নয়। সবাই জানিয়াও ভদ্র পরিবারের মান রক্ষা করিবার জন্য চাপিয়া গিয়াছে। শুধু এই নয়, সে যে ব্রজেন্দ্রের টাকা অপহরণ করিয়াছে এবং অপরাপর বহুস্থানে ছোট খাট জিনিষ সরাইয়াছে, সে কথাও অনেকে জানে বলিয়া সে সন্দেহ করে। এই সেদিন যখন ভট্টাচার্য্যের ফরাসের উপর হইতে রূপার নস্যের কৌটাটা সে গোপনে সরাইল, তখন অনেকে তাকে ঠাসিয়া অনেক রকম কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, কেবল তাহার শরীর খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া সে বাঁচিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঁচের বাড়ীতে বাস করিয়া পরের বাড়ীতে ঢিল ছুড়িতে তার সাহস হইল না।

কিন্তু বিরজার জেদে সে তাহার থিয়েটারের চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইল।

২

বিরজা কান্নাকাটি করিয়া তার যেখানে যে আত্মীয় কুটুম্ব ছিল সকলের কাছে চিঠি লিখিল, প্রাণকুমারের একটা কাজ জুটাইবার জন্য। অবশেষে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের চেষ্টায় প্রাণকুমার এক ষ্টীমার কোম্পানীতে একটা চাকুরী পাইয়া গেল। মাহিনা আপাততঃ ১৫৲ টাকা, তবে উন্নতির আশা আছে; আর,—উপরি যথেষ্ট।

বিরজা এ গ্রামে একলা থাকিতে সম্মত হইল না, সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

ছয় মাসের মধ্যেই প্রাণকুমার মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা উপায় করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া দুধ মাছ পান প্রভৃতি জিনিস সে মহাজনদের কাছে নানা রকমে উপহার পাইত। একবার সে দেখিতে পাইল যে ষ্টেশনে একবস্তা চিনি বেগর হিসাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সে তাড়াতাড়ি সেই দুই মণ চিনি সরাইয়া ফেলিল। এমনি করিয়া সে বেশ গুছাইয়া লইল। আবার এদিকে কাজ করিয়া সে সকলকে খুসী করিল। উপরওয়ালারাও তার কাজে খুসী হইলেন, আর যে সব মহাজনের তার সঙ্গে কারবার করিতে হইত, তাহারাও মামুলী দর্শনী দিয়াই কাজও পাইত এবং সদ্ব্যবহার পাইত দেখিয়া, মাল বাবুর উপর ভারী খুসি হইল।

বিরজা তাহার কাছে আসিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাই সে ঠন্‌ঠনে বালির চড়ার উপর, যেন তেন করিয়া বেড়াটাট্টি দিয়া দুখানা ঘর বাঁধিয়া বিরজাকে লইয়া আসিল। দিন বেশ কাটিতে লাগিল। বিরজার কোনও জিনিসেরই দুঃখ নাই, যথেষ্ট পরিমাণে দুধে মাছে খাইয়া

ছেলে পিলে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ;—কিন্তু সংখ্যায়ও তাহারা বাড়িয়া উঠিল।

এ কয়মাসে প্রাণকুমারের পুরাতন নেশার অনেক গুলিই ফিরিয়া আসিয়াছিল। ষ্টেশনের ধারে একটা বাজার ছিল, সেখানে একটা আবকারী দোকান ছিল এবং বেশ্যাও ছিল। যতদিন বিরজা না আসিয়াছিল, ততদিন প্রাণকুমার রাত্রে ডিউটি না থাকিলে পুঁটির বাড়ীতেই থাকিত। এবং আশ মিটাইয়া মদ খাইত।

বিরজা যখন আসিল, তখন দেখিল যে, তার স্বামীর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পুঁটির কথা সে শীঘ্রই জানিল। তাহা ছাড়া পাশাপাশি গ্রামের গৃহস্থের বৌঝির মধ্যেও দুই চার জন সম্বন্ধে তার বেশ সন্দেহ হইল। কিছুদিন সে ঝগড়া ঝাটি করিল ; কিন্তু সে দেখিল, ঝগড়া করিয়া স্বামীকে চটাইয়া তার বিশেষ লাভ নাই। আর একদিকে চাহিয়া সে দেখিল, তাহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, তার ছেলে পিলে পেট ভরিয়া খাইয়া আছে। তা ছাড়া তার হাতেও দু পয়সা জমিতেছে। অভাব ও অনাহারের সঙ্গে তার পরিচয় হইয়াছিল, তাই এসবের যে কতখানি মূল্য আছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। তার পর সে জানিল যে তার তিনটি (পরের বৎসর চারটি) ছেলেপিলে মানুষ করিবার দায়িত্ব ভার নিজের লইতে হইবে, স্বামীর উপর এ বিষয়ে নির্ভর করা মিথ্যা। কাজেই সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সব দুঃখ অপমান হজম করিয়া, টাকা জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর এ কথাও বলিতে হইবে যে, প্রাণকুমারের দোষ যা'ই থাক, স্ত্রীর সঙ্গে সে অন্য বিষয়ে বেশ সদ্ব্যবহার করিত এবং তাহাকে আদরও করিত। সে যখন তার ঐ কার্ত্তিকের মত মূর্ত্তি হইয়া আদর করিয়া বিরজাকে কোলে টানিয়া লইত, তখন বিরজা রাগ করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না।

কিন্তু দিনের পর দিন প্রাণকুমারের বেশী করিয়া অধঃপতন হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তার কাজে গাফিলি হইতে লাগিল। সে এত মদ খাইতে লাগিল যে, খাতা লিখিতে দুই চারিটা গুরুতর ভুল করিয়া ফেলিল। ভুল ধরা পড়িলে, সব-এজেণ্ট সাহেব তাহাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহাকে ষ্টীমারের কাজে দিলেন। তার সুন্দর মূর্ত্তি, মোলায়েম ব্যবহার এবং কর্ম্মপটুতার জন্য সাহেবের তাহার উপর বেশ একটু স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল। তাই যে অপরাধে অন্য লোককে তিনি ডিস্‌মিস্‌ করিয়া ফেলিতেন, সে অপরাধের জন্য প্রাণকুমারকে বদলী করিলেন ষ্টীমারে।

এ চাকরীতে তার একাদিক্রমে সাত আট দিন ষ্টীমারে থাকিতে হইত। কাজেই বিরজা.ক আবার পিত্রালয়ে যাইতে হইল। তার সুখের দিন আপাততঃ ফুরাইল, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেল।

প্রাণকুমার কিছুদিন খুব মনোযোগ করিয়া কাজ করিতে লাগিল। উপরি যথেষ্ট আসিতে লাগিল। পতিবিয়োগ-বিধুরা সতী একজোড়া ভারী অনন্ত গড়াইয়া শোক কথঞ্চিত প্রশমিত করিল।

ক্রমে প্রাণকুমারের ভাল হইবার মোহ কাটিয়া গেল। কিছু দিন উপরওয়ালাদের খুসী করিয়া সে আবার তার পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। আর যতই সে দুঃসাহসে সফলতা লাভ করিল, ততই তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। শেষে সে ফার্ষ্টক্লাসের আরোহী এক মেমসাহেবের গায় হাত দিয়া ডিস্‌মিস্‌ ও ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইল।

সাহেব সুবাদের হাতে পায়ে ধরিয়া, বিশেষ করিয়া এজেণ্ট সাহেবের স্ত্রীর কাছে কান্নাকাটি করিয়া, অনেক লাঞ্ছনার পর সে মোকদ্দমা হইতে মুক্তি পাইল। তাহার সুন্দর মুখের জোরে এবারও প্রাণকুমার বাঁচিয়া গেল।

নিঃসম্বল হইয়া প্রাণকুমার শ্বশুরালয়ে ফিরিল। সেখানে আসিয়া সে এক

কুৎসিত ব্যাধিতে শয্যাগত হইল। বিরজা কাঁদিয়া ভাসাইল; স্বামীকে গালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দিল। কিন্তু যখন তার সুন্দর স্বামী কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার ক্ষমাভিক্ষা করিল, আর তার গায় হাত দিয়া শপথ করিল যে এমন অপকার্য্য আর সে করিবে না, এবং শেষ পর্য্যন্ত বিরজার পা জড়াইয়া ধরিতে আসিল, তখন বিরজাই কাঁদিয়া তার পায় লুটাইয়া পড়িল, এবং তার ক্ষত বহুল দেহ অম্লান বদনে আলিঙ্গন করিয়া তুলিল।

অশেষ যত্ন চেষ্টা ও শুশ্রূষায় প্রাণকুমার রোগমুক্ত হইল। ডাক্তারের টাকা যোগাইতে যখন বিরজার পুঁজি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন তার ভাইয়ের পরামর্শে সে এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাকাইল।

এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকটি পূর্ব্বে ছিলেন সৈদপুরের রেল আফিসের কেরাণী। সেখানে একজন ভারি নামজাদা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, এ ব্যক্তি তার কাছে যাতায়াত করিত। তার পর সে কেরাণীগিরি করিতে করিতেই দুই তিনখানি বই ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধের একটা বাক্স কিনিয়া বন্ধুমহলে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর হঠাৎ তাহার চাকরী গেল। তখন সে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ও বই লইয়া গ্রামে আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিল। এখন সে বেশ দু-পয়সা রোজগার করিয়া খাইতেছে।

ইহাকে দেখিয়া প্রাণকুমারের চিত্তে নূতন খেয়াল জাগিয়া উঠিল। তাহার ব্যাধি তখন অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে, সে এখন ডাক্তার বাবুর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। শেষে সে যখন রোগমুক্ত হইল, তখন ম্যাঙ্গালোর হইতে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং চিকিৎসার খান দুই বই লইয়া সে বাড়ী ফিরিল।

বাঁশবন গ্রামে ও আশে পাশে তিনটি চিকিৎসক ছিলেন। একটি প্রাচীন কবিরাজ, খাঁটি আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করেন, কিন্তু অধিকাংশ ঔষধ প্রস্তুত করিবার সঙ্গতি তাঁহারও নাই আর তাঁহার রোগীদেরও নাই। সুতরাং কয়েকটি মামুলী ঔষধের দ্বারা তিনি চিকিৎসা করেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে চিকিৎসা করিয়া তিনি গুরুর কাছে যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাও ভুলিয়া রহিয়াছেন। দ্বিতীয়টি ঢাকা স্কুলের বহুকাল পূর্ব্বের পাশ করা ডাক্তার, এককালে সুচিকিৎসক ছিলেন। এখনও রোগ নির্ণয়ে ও ঔষধ নির্ব্বাচনে তিনি মাঝে মাঝে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু সে কালে ভদ্রে। তাঁহার ঔষধের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য, কাজেই অনেক স্থলে ঔষধের স্থলে অট্টালিকা চূর্ণ প্রভৃতি ঋষি প্রণীত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় চিকিৎসকও কবিরাজ। তাঁহার বিদ্যা সামান্য, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। বয়সে তিনি নবীন, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে প্রবীণ। কলিকাতা হইতে কবিরাজী ঔষধ কিনিয়া আনিয়া তিনি চিকিৎসা করেন। কিন্তু কবিরাজীই তাঁর একমাত্র সম্বল নয়। তিনি কুইনাইন ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য এলোপ্যাথিক ঔষধ অম্লানবদনে ব্যবহার করেন। তাই তাঁহার বিস্তীর্ণ পসার।

প্রাণকুমার যে বাড়ীতে আসিয়া বসিল, তাহাতে বিরজা আনন্দিত হইল। দেশে বসিয়া বদ খেয়াল কাটিয়া গিয়া প্রাণকুমার পূর্ব্বের মত হইবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া বিরজা আবার বাঁশবন গ্রামের কুটীরে সংসার পাতিয়া বসিল। প্রাণকুমার বিনা পয়সায় গ্রামবাসীর চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল; বিরজা তার সঞ্চয়ের টাকা, ও ক্রমে তার সাধের গহনা ভাঙ্গিয়া সংসার চালাইতে লাগিল। সে একাই সংসারের সমস্ত কাজ করিত, ঘরের "ডোয়া" লেপিবার জন্যও সে মালী-বৌএর সাহায্য লইত না। স্নানের পূর্ব্বে

কোদাল দিয়া সে আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করিত; তা ছাড়া রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলে মানুষ করা তো আছেই। খুব হিসাব করিয়া খরচ করিয়া এক বৎসর বিরজা নিজেই সংসার চালাইল। নিজে সে অনেক সময় না খাইয়া থাকিয়া পয়সা বাঁচাইত, কিন্তু স্বামী ও সন্তানের যত্ন করিয়া খাওয়াইত। এমনি করিয়া না খাইয়া খাটিয়া খাটিয়া তার হাড় কালি হইয়া গেল, তাহার রূপ তিল তিল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এত সহিয়া, এত পরিশ্রম করিয়াও সে হাসি মুখে থাকিত, কেন না, প্রাণকুমার এখন বাড়ীতে থাকে, ছেলেপিলেদের আদর করে, এবং বিরজাকেও আদর করে।

প্রাণকুমারের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ শোধরায় নাই। এখনও তার পুরাতন ইয়ার বন্ধুদের নিমন্ত্রণে সে মাঝে মাঝে 'ফূর্ত্তি' করিতে যায়, পাড়ার ভিতরেও তার অবৈধ গতিবিধি একেবারে না আছে এমন নয়।

একবার দেশে ফিরিয়া বিরজা দেখিতে পাইল, বাড়ীর দুয়ারে আর এক উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে এ গ্রামের চার ক্রোশের ভিতর মদের দোকান ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি একটি দোকান একেবারে গ্রামের মহড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক সময় সেখান দিয়া যাতায়াত করিতে প্রাণকুমার দুই এক ঢোঁক না খাইয়া পারিত না। তবু প্রাণকুমার নিজের পয়সা খরচ করিয়া স্ফূর্ত্তি বড় বেশী করিত না, আর সে বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই থাকিত। ইহাতেই বিরজা খুসী ছিল।

৩

এক বৎসর কাটিয়া গেল ; বিরজা চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এ বৎসর প্রাণকুমারের চিকিৎসা ব্যবসায়ে মবলগ আয় হইল কুড়ি টাকা, এক পশারী ধান, একটা পাঁটা ও কিছু তরীতরকারী। বিরজার পুঁজি ফুরাইয়া আসিল, অথচ শীঘ্র আয় বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার স্বামীকে পরামর্শ দিল যে, খবরের কাগজে নানারূপ অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব ঔষধ আনাইয়া চিকিৎসা করিলে বোধ হয় তাহার পশার হঠাৎ বাড়িতে পারে। প্রাণকুমার তাহার পরামর্শে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নানারকম পেটেণ্ট ঔষধওয়ালার কাছে চিঠি লিখিতে লাগিল যে, তাহারা যদি তাহাকে বিনা মূল্যে কিম্বা বাকীতে কিছু ঔষধ পাঠাইয়া দেয়, তবে সে ঔষধ বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। সে চিঠিতে নাম স্বাক্ষর করিল "ডাক্তার প্রাণকুমার ঘোষ।" কিন্তু সে সব চিঠির কোনও উত্তর আসিল না।

অবশেষে একদিন বিরজা কম্পিতপদে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানা বিষয়ে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক বিস্তীর্ণ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির জোরে তিনি একজন জমীদার বিশেষ। তাহা ছাড়া, তিনি এ অঞ্চলের মধ্যে পণ্ডিত ও সমাজের নেতা বলিয়া সম্মানিত। তাঁর বাড়ীতে পাঁচ ছয়টি বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়, অনেক লোক প্রসাদে প্রতিপালিত হয়।

বিরজা যখন ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর কাছে অভ্যাস মত আধ হাত ঘোমটা টানিয়া বসিল, তখন গৃহিণী ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। দাওয়ার

উপর মাদুর পাতিয়া তাঁর বিপুল দেহ ছড়াইয়া দিয়া তিনি মহাভারত পাঠ করিতেছেন। দাওয়ার অপর দিকে তাঁর আশ্রিতা এক বিধবা কুটুম্বিনী ঠাকুরের বৈকালীর আয়োজন করিতেছেন। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর, বিরজা তখনও অভুক্ত।

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী বিরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে লো তুই?" বিরজা প্রণাম করিয়া বসিলে, ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, প্রাণকুমারের বৌ! তোর এ কি হাল হয়েছে! অনেক দিন তো আসিস্ নি, দেখিও নি। এ কি ছিরি বেরিয়েছে।"

বিরজা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী বলিলেন, "তা' এসেছিস, বেশ হয়েছে; পড় একটু মহাভারতখানা পড় শুনি।"

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিরজার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল। পড়িতে পড়িতে তার গলা ভয়ানক ধরিয়া গেল। সে খুস খুস করিয়া কাশিতে লাগিল। বহুকষ্টে সে সুভদ্রা পরিণয় শেষ করিয়া বই রাখিল—সে আর পারিল না। তখন পাঁচি চাঁড়ালনী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিধবা কুটুম্বিনী উঠিয়া ঠাকুর ঘরে গেলেন।

পাঁচিকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। সাদর সম্ভাষণের পর তাহাকে পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঁচি দাওয়ার বাহিরে উঠানে বসিয়া হাসিয়া বলিল, "সে এক কেচ্ছা ঠাকরুণ দিদি, সে এক কেচ্ছা। কালে কালে হ'ল কি? এর পর মা ছেলে এক সাথে থাক্‌বে!"

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী বেশ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি লো, কি কেচ্ছা, বল্ না শুনি।"

পাঁচি তার পর সাঙ্গোপাঙ্গে গ্রামের একটি ভদ্র মহিলার কলঙ্কের কথা বলিয়া গেল এবং বলিল, তাঁর সে প্রেমাভিনয়ে নায়ক প্রাণকুমার ডাক্তার।

পাঁচি বিরজাকে লক্ষ্য না করিয়া কথাটা বলিয়াছিল; ভট্টাচার্য্য গৃহিণী

ইসারা করিতেই সে বিরজার দিকে চাহিয়া কথাটা শুধরাইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। বিরজার সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তার স্বামীর স্বভাব চরিত্র বরাবরই খারাপ, লোকের কাছে এ জন্য সে চিরদিনই লজ্জা পাইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সামনাসামনি কেউ কোনও দিন তাকে এমন কথা শুনাইয়া যায় নাই।

বিরজা বড় দুঃখে পড়িয়া আসিয়াছিল—সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সে ভট্টাচার্য্য গৃহিণীকে নিজের দুঃখের কথা বলিয়া কিছু টাকা ধার চাহিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। ধার যে এ জন্মে শোধ হইবে সে আশা তার ছিল না; তবু যদি ভট্টাচার্য্য গৃহিণী ধারের নাম করিয়া টাকাটা দেন সেই আশায় সে আসিয়াছিল। এতদিন সে কাহারও কাছে টাকা ধার করে নাই, কোনও দিন কাহাকেও ধার দেয় নাই, তাই ধার চাহিতেও সে লজ্জায় মুশড়াইয়া যাইতেছিল। তার মনে মনে ছিল যে, ধার যদি নাই পায়, তবে সে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া বসিবে যে, ভট্টাচার্য্য গৃহিণী যদি তার ছেলে পিলে কটিকে ঠাকুরের প্রসাদ দিয়া প্রতিপালন করেন, তবেই তাহারা খাইয়া বাঁচে।

কিছুই বলা হইল না, এমন লজ্জার পর আর সে কেমন করিয়া ভিক্ষা করিবে? বিরজা উঠিল। পাঁচিও উঠিয়া চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী তার মুখের দিকে চাহিয়া আঁচ করিলেন, সে কিছু বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু লজ্জা পাইয়া আর কোনও কথা বলিল না। তিনি বলিলেন, "কি বউ, চল্লি যে, কোনও কথা ছিল?"

"না, বলিয়া বিরজা থামিল। শেষে অত্যন্ত আমতা আমতা করিয়া বলিল, "দুটো টাকা ধার চাইতে এসেছিলাম।"

গৃহিণী অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "টাকা তো এখন আমার কাছে নেই; দু' চার দিন পরে হ'লে বরং দিতে পারতাম।"

"আমার আজ বড় ঠেকা ছিল," বলিয়া বিরজা একপায় দু'পায় অগ্রসর হইল, তার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ভট্টাচার্য্য গৃহিণী অশ্রু লক্ষ্য করিলেন, তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন "কেনরে বউ, এত ঠেকা কিসে?'

বিরজার বলিতে হইল, তার ঘরে খাইবার কিছুই নাই। শেষ চারটি চাল আজ সে স্বামী ও সন্তানদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছে। ওবেলা তাহাদের পাতে কি দিবে, তাহা সে জানে না, বলিয়া বিরজা আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গৃহিণী নরম হইয়া পড়িলেন; কিন্তু একটা লোকের কান্না দেখিলেই যদি টাকা ফেলিয়া দিতে হয়, তবে টাকা জমানও হয় না। সুতরাং গৃহিণী বলিলেন "আমার হাতে তো টাকা নেই এখন; তা আচ্ছা, তুমি কালকে সকালে এসো, দেখি কি করতে পারি।"

ঘরের ভিতর হইতে এ কথা শুনিলেন একটি বিধবা ব্রাহ্মণী—ভট্টাচার্য্যের আশ্রিতা; দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন "কি চশমখোর।" বিরজা যখন আস্তে আস্তে চক্ষু মুছিয়া চলিয়া গেল, তখন এই ইচ্ছাময়ী ঠাকুরাণী ছুটিয়া গেলেন দত্ত-গৃহিণীর কাছে। তাঁহার নিকট ভট্টাচার্য্য গিন্নীর চশমখোরির কথা বলিয়া ইচ্ছাময়ী দুইটা টাকা ধার চাহিলেন। দত্তগৃহিণী খুশী হইয়া টাকা দিয়া বলিলেন, "এ টাকা আমি তোমাকে দিলাম না, বিরজাকে দিলাম, তাকে আমার কথা বলে দিও।" ইচ্ছাময়ী তখনই বিরজাকে গিয়া পথে ধরিয়া টাকা দুইটা দিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার পর দত্তগৃহিণী তাহাকে এটা ওটা সেটা দিতে, এবং আবশ্যক মত দুইবার টাকা "ধার" দিয়া তাহাকে চালাইতে লাগিলেন। ধারের টাকা বিরজা কোনও দিনই শোধ করিতে পারিত না। তাই সে এক দিন

কাঁদিয়া দত্তগৃহিণীকে বলিল, "আর আমি আপনার কাছে কেমন করে টাকা নি ? শোধ তো কিছুই করতে পারছি না ?"

দত্তগৃহিণী বলিলেন, "নাই যদি শোধ ক'রতে পার তুমি, তবু আমি তো আমার দায় থেকে উদ্ধার হ'ব। আমারও তো তোমার কাছে কিছু দেনা আছে।"

বিরজা অবাক্ হইয়া বলিল "আমার কাছে আপনার দেনা !"

হাসিয়া দত্তগিন্নী বলিলেন, "নেই ? যদি তোমার বিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে না দিতাম, তবে তো এসব টাকা তোমারই হত।"

বিরজা একটু হাসিল, কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। একদিন সে তার সুন্দর তরুণ স্বামী পাইয়া ভাবিয়াছিল যে, দত্তমহাশয়ের সঙ্গে তার বিবাহ না হওয়াটা কত বড় সৌভাগ্যের কথা হইয়াছে ! আজ ক্ষুধায় পীড়িত ও স্বামীর ব্যবহারে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া তার মনে হইল, শরৎ দত্তের সঙ্গে বিবাহ হইলে এমনি কি মন্দ হইত, দুটো খাইয়া তো বাঁচিত।

ইহার পর দত্তগিন্নী বিরজার ছেলেপিলেকে প্রায়ই নিজের বাড়ীতে লইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ফুট্‌ফুটে চাঁদের মত ছেলেপিলে, কার না তাহাদের আদর করিতে ইচ্ছা করে। নিঃসন্তান দত্তগৃহিণী যে তাহাদিগকে টানিবেন সে আর বিচিত্র কি ? শেষে তিনি বিরজাকে একদিন খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন।

দত্তগৃহিণী গ্রামের গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সমাজে বন্ধ ছিলেন। বিরজার বিবাহের দিন, বিবাহের বৈঠকে বসিয়াই এই একঘরে করার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, তাই বিরজা তাহা ভাল করিয়াই জানিত। দত্তগৃহিণীর বাড়ীতে সে খাইলে তার স্বামী জাতিচ্যুত হইবে বলিয়া সে খাইতে সঙ্কুচিত হইল। সে

জানিত যে তাহার স্বামী ষ্টীমারে চাকরী করিবার সময় না খাইয়াছে এমন বস্তু ছিল না। তাহা ছাড়া প্রায় রাত্রেই সে যে সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহারা জাত্যংশে বা সতীত্বগুণে দত্তগৃহিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে—এবং তাহাদের ঘরে যে প্রাণকুমার অনাহারে রাত্রি যাপন করিয়াছে এরূপ মনে করিবারও কোনও হেতু ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া দত্তগৃহিণীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে তার সাহস হইল না; অথচ তার এই পরম উপকারী সুহৃদকেও সে ক্ষুণ্ণ করিতে ভরসা করিল না। দত্তগিন্নী যে তার ছেলেপিলেদের বিশেষ আদর যত্ন করেন, এজন্যই সে তাঁহাকে ভক্তি করিত। অনেক ভাবিয়া সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল; কিন্তু দত্তগিন্নী চলিয়া গেলে সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পেটের ব্যথা করিয়া বসিল এবং শেষ পর্য্যন্ত খাইতে গেল না।

দত্তগিন্নী ইহাতে হঠিবার পাত্র নন। তিনি তাহাকে আবার নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত বিরজাকে খাওয়াইয়া ছাড়িলেন।

বিরজা ভাবিয়াছিল, ইহাতে একটা ভীষণ সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু কিছুই হইল না। দত্তমহাশয়কে একঘরে করা হয় সাতবৎসর আগে। এ সাতবৎসরের ভিতর লোকের এ বিষয়ে চেষ্টা ও উৎসাহ অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বিরজা পরে জানিতে পারিল যে, আজকাল দত্তবাড়ীতে অনেকেই আহারাদি করে। তবে সামাজিক খাওয়া দাওয়ায় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে না।

দত্তগৃহিণীর এই অহেতুকী প্রীতিতে যখন বিরজায় হৃদয় কৃতজ্ঞতায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি তাহার কাছে প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে, বিরজার দ্বিতীয় ছেলেটিকে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন।

এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত অন্তর দত্তগৃহিণীর উপর বিষ হইয়া উঠিল। ছেলেকে বুক হইতে ছিঁড়িয়া পর করিয়া লোকে কেমন করিয়া দেয়! নিজের ছেলে পরকে মা বলিবে, ইহা লোকে কেমন করিয়া সহ্য করে ভাবিয়া সে অবাক্ হইল। সে কাঁদিয়া কাটিয়া একশেষ করিল।

প্রাণকুমার বলিল, "কাঁদ কেন! তুমি না দিলে তো আর সে ছেলে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না? এতে কান্নার কি আছে। ছেলে দাও দেবে, না দাও না দেবে। এতে কান্নার কথাটা কি?"

কাঁদিয়া বিরজা বলিল, "কিন্তু এ কথা বলে কোন মুখে? কি আক্কেলে বলে?"

"না ব'লবে কেন? তার ছেলেপিলে নেই, আর তোমার ছেলে মেয়ে এই সাতবছরেই পাঁচটি হ'য়েছে, আরও যে ক'টি হবে তার ঠিক নাই।"

"ষাট্, ষাট্, কি যে সব বল বাপ হ'য়ে, তার ঠিক নেই।"

"আচ্ছা ষাট্, ছশোবার ষাট্। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, তোমার ছেলে আছে তিনটি, আর আরও হ'বার যথেষ্ট সম্ভাবনা র'য়েছে। আর সে ছেলে ভরপেট খাইয়ে প্রতিপালন ক'রবার ক্ষমতা তোমারও নেই আমারও নেই।"

প্রাণকুমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বিরজা বলিল, "ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন, উপায় একটা হ'বেই।"

আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রাণকুমার বলিল, "এ উপায়ও তো ভগবানই ক'রে দিয়েছেন। তোমার ছেলেটাকে সুন্দর করে' দত্তগিন্নির মন ভিজিয়ে তিনি তাদের সবার অন্নের একটা জোগাড় করে দিয়েছেন। দত্ত মশায় বলেছেন যে, তিনি আমার সব ছেলে পিলে মানুষ করবার

ভার নেবেন। তা' ছাড়া, এক রকম তো দত্তগিন্নীই তা'দের মানুষ ক'রছেন।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে অসহায় ভাবে বিরজা পুত্র দান করিতে সম্মত হইল। যাগযজ্ঞ করিয়া শরৎদত্ত বিরজার দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিলেন।

৪

অবশেষে প্রাণকুমারের কপাল ফিরিল। দেশে হঠাৎ ভয়ানক কলেরার মড়ক লাগিয়া গেল। চিকিৎসকদের লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। দিবা রাত্রি প্রাণকুমার রোগী দেখিয়া ফিরিতে লাগিল।

প্রাণকুমারের অদৃষ্টের জোরে যে কয়টি রোগীকে দেখিল, সব কয়টিই বাঁচিয়া উঠিল, আর অন্য চিকিৎসকের অনেক রোগী মরিতে লাগিল। এটা যে তার চিকিৎসায় পারদর্শিতার ফল নয়, নিছক অদৃষ্টের গুণ, সে কথা সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। ডাক্তার বল, কবিরাজ বল, হাকিম বল, সত্য কথা বলিলে সবাই স্বীকার করিবেন যে, রোগীর মরণ বাঁচন তাঁদের হাতে যদি এক পোয়া থাকে, তবে অদৃষ্টের হাতে অন্ততঃ তিন পোয়া নির্ভর করে। বেশীর ভাগ রোগী আপনা আপনি আরাম হয়, আর বাহাদুরী পায় চিকিৎসক। ইহা না হইলে পৃথিবীতে হোমিওপ্যাথি ইলেক্ট্রোপ্যাথি হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র তন্ত্র তুক তাকের এত প্রাচুর্য্য হইতে পারিত না।

কিন্তু প্রাণকুমারের পসার যে কেবলমাত্র তার অদৃষ্টের ফল, তার আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। বলা বাহুল্য, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাণকুমারের খুব অল্পই জানা ছিল। সে রোগীর বাড়ী বসিয়া বই খুলিয়া রোগের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ দিতে থাকিত। ইহাতে যখন সে হালে পাণি পাইত না, রোগীর এমন একটা অবস্থা হইত যে সে কিছুই ঠিক করিতে পারিত না, তখন সে ঔষধের বাক্স সম্মুখে লইয়া চক্ষু বুজিয়া 'শ্রীদুর্গা' বলিয়া যে কোনও একটা শিশি বাহির করিয়া ফেলিত। ইহা দৈবের দান বলিয়া সে বিশ্বাসের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিত। ইহাতে সকল শাস্ত্র বহির্ভূত

ঔষধ প্রযুক্ত হইত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমনি করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও তার হাতে রোগী আরাম হইত।

তার পর আর এক বিপদ হইল। মড়কের প্রকোপে তার ঔষধের পুঁজি শেষ হইয়া গেল। সে ম্যাঙ্গালোরে ঔষধের জন্য চিঠি লিখিল, এবং ইতিমধ্যে "ভেরাট্রম" স্থলে "একোনাইট," "মার্কিউরিয়াস" স্থলে "ডালকামেরা" ব্যবহার করিয়া সমান ফল লাভ করিতে লাগিল। শেষে ঔষধ ফুরাইলে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া নিছক ডিষ্টিল করা জল রোগীকে দিয়াও আরাম করিতে লাগিল। ললিত ডাক্তারের অট্টালিকা রসায়নের চেয়ে ইহাতে উপকার যে বেশী হইল তাহা বিচিত্র নয়।

যাহাই হউক মড়কের গুণে প্রাণকুমার ডাক্তারের পশার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তার নিজের মুখে এবং লোকের মুখে মুখে তার চিকিৎসার আশ্চর্য্য সুফলের কথা শুনিতে শুনিতে লোকের কান ঝালাপালা হইয়া গেল।

বিরজার সুদিন আসিল। যে সকলের ধার নিঃশেষে শোধ করিয়া ফেলিল এবং তার অবশিষ্ট ছেলেপিলে লইয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

আর একটা সুখের কথা এই যে, এই বাড়ী বাড়ী মড়া ঘাঁটিয়া প্রাণকুমারের চরিত্রের অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে নেশা ছাড়িল, গৃহে রাত্রি যাপন করিতে লাগিল এবং পরনারীর উপর তার লোভ একদম সারিয়া গেল। বিরজার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

প্রাণকুমারের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। যে যে রোগী তাহার হাতে আরাম হইয়াছে, তাহা যে কেবল মাত্র তাহার ঔষধের অসাধারণ ক্ষমতায় হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। ঔষধের শিশিতে পরিস্রুত জল দিয়া ফললাভ করিয়াও তাহার এ বিশ্বাস

টলিল না। সে নিজেকে বুঝাইল যে, ঔষধের খালি শিশির গায় যেটুকু ঔষধ লাগিয়া ছিল, তাহা এই পরিস্রুত জলে ডাইলিউশন হইয়া high potencyর ঔষধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে ইহার দ্বারা সুফল লাভ করিয়াছে। তাই সে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যত রকম বই ছিল আনাইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহা ছাড়া তার আর একটা বিশ্বাস এই অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল যে তার ভিতর চিকিৎসা ঘটিত একটা দৈবী শক্তি আছে। সে যখন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া চক্ষু বুজিয়া ঔষধ বাহির করিত, তখন সে ঔষধে সে অসাধারণ ফল দেখিতে পাইত। তাহার অঙ্গুলির ভিতর দিয়া এ ব্যাপারে কোনও অসাধারণ দৈবী শক্তি প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। ইহা হইতে ক্রমে সে অবধৌতিক ঔষধ, মাদুলী প্রভৃতিতে আস্থাবান হইয়া উঠিয়া নানাস্থান হইতে তাহা সংগ্রহ ও শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সে তার কুলগুরুর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূজা অর্চ্চনায় অনেকটা সময় কাটাইতে লাগিল। তার কুচকুচে ঢেউ খেলান চুল এখন বাড়িয়া তাহার স্কন্ধের উপর পড়িল; দাড়ি বাড়িয়া বুক ঢাকিয়া ফেলিল, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা গলায় ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। ক্রমে সে গৈরিক পরিতে লাগিল। তার অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি যখন সে এমনি করিয়া সাজাইয়া বিরজার কাছে উপস্থিত হইত, তখন বিরজার হৃদয়ে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, ভক্তিতে গদগদ হইয়া সে গলায় আঁচল জড়াইয়া তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িত। সে সব ভুলিয়া গেল। তার স্বামীর কুচরিত্রের কথা, বিরজার লাঞ্ছনার কথা, তার দুঃখ দৈন্যে উদাসী স্বামীর নানা পাপাচারের কথা, সব সে ভুলিয়া গিয়া স্বামীর মূর্ত্তিতে ঋষির ছাপ দেখিতে পাইল—দেবতা যেন

মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, এমনি সে মনে করিল।

একে তার এই লোক মনোহর মূর্ত্তি, তাহাতে আবার তার সুশিক্ষিত সুমধুর কণ্ঠ! প্রাণকুমার যখন সেই কণ্ঠে প্রেমের সঙ্গীত ছাড়িয়া রামপ্রসাদের মালসী গাহিতে আরম্ভ করিল, তখন বিরজার অন্তর ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিল। সে যেন হাওয়ার উপর চড়িয়া সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, ইহাতে প্রাণকুমারের পাশার প্রতিপত্তি ও সম্মান চারিদিকে ভয়ানক ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পর হঠাৎ একদিন প্রাণকুমার বিরজার কাছে প্রস্তাব করিয়া বসিল, তাহারা তীর্থে যাইবে। বিরজা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যখন স্বামী প্রস্তাব করিলেন যে, ছেলেপিলেদের রাখিয়া যাইতে হইবে, তখন সে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দত্তগিন্নীর কাছে ছেলেপিলেগুলি রাখিয়া সে স্বামীর সঙ্গে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইল।

হরিদ্বারে গিয়া প্রাণকুমার এক সন্ন্যাসীর দেখা পাইল; সে দিনরাত তাহার কাছে গিয়া পড়িয়া থাকিত। সন্ন্যাসীকে সে তার ভিতরকার পরীক্ষিত দৈবশক্তির কথা জানাইল। সন্ন্যাসী শুনিয়া তাহার এমন একটা ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন যে, প্রাণকুমারের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তার ভিতর না কি একটা প্রকাণ্ড শক্তি নাভিকুণ্ডলে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে, কেবল বন্ধনের জন্য সে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। এই শক্তির বাধাগুলি যদি সে মুক্ত করিতে পারে, তবে অতি সহজেই অণিমা, লঘিমা প্রাকাম্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবে। সে স্পর্শ করিলে রোগী রোগমুক্ত হইবে, ইচ্ছা করিয়া হাত পাতিলে তার হাতে কুবেরের সম্পদ ঝর ঝর করিয়া পড়িবে।

প্রাণকুমার এই শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য ছটফট করিয়া উঠিল। কি সে বাধা? কি সে বন্ধ? যাহা তাহার হাত হইতে এই শক্তিকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। যদি সে বাধাগুলিকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া এক শক্তির সন্ধান পায় তবে—তবে সে যে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সে সাধুর পায় প্রণত হইয়া বলিল "প্রভু আমায় দীক্ষা দিন, কি করিলে আমি সেই শক্তি লাভ করিব বলিয়া দিন।"

অনেক দিন সাধুর কাছে থাকিয়া তিনি উপদেশ ও দীক্ষা লাভ করিয়া শেষে গুরুর অনুমতি লইয়া দেশে ফিরিলেন। সাধু বলিয়া দিলেন যে বার বৎসর তাঁর প্রক্রিয়া সাধনা করিলেই সে শক্তি লাভ হইবে। শক্তিটা নাকি প্রাণকুমারের ভিতর বড় প্রবলা, তাই সে ঘরে থাকিয়াও ইহার সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। না হইলে অন্য লোকে বনে অতিকৃচ্ছ্র তপস্যা করিয়াও ইহা পাইত না।

৪

বাড়ী ফিরিয়া প্রাণকুমার তপস্যায় মনোনিবেশ করিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের চেয়ে সে এখন তার গুরুদত্ত অবধৌতিক ঔষধ খুব বেশী ব্যবহার করিত। আর জপতপ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে খুব বেশী সময় কাটাইত।

বিরজার জীবন আবার অসহ্য হইয়া উঠিল। জপতপের আধিক্যে প্রাণকুমারের ব্যবসার আয় অত্যন্ত কমিয়া গেল, কাজেই সংসার চালাইতে আবার টানাটানি হইতে লাগিল। আবার এদিকে প্রাণকুমারের জপ-তপের আয়োজন করিতে বিরজার প্রাণ বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত বাড়ী তার গোবর দিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া ঝক্ ঝকে করিয়া রাখিতে হইত, কোথাও একটু অশুচিতার গন্ধ পর্য্যন্ত থাকিলে প্রাণকুমার ক্ষেপিয়া উঠিত। তার পর যে ঘরে স্বামী যোগাসনে বসিতেন, সে ঘরটাকে পূজার ঘরের মত নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া রাখিতে হইত। তবে সুখের বিষয়, বড় দুইটি মেয়ে এখন কাজের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দশবছর ও নয়বছর তাদের বয়স, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহারা সংসারের বারো আনা কাজ করিতে পারে। বড় মেয়ে লীলা একবেলা রান্না করে, না হয় বাসন মাজে।—সে কি উপদ্রব! প্রত্যহ বোকনা কড়াই প্রভৃতি মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিতে হয়,—প্রাণকুমার বাসি বাসন হেঁসেলে থাকিতে দেয় না। মেজ মেয়ে উৎপলা সমস্ত ঘর ঝাঁট দেয়, আর ছোট্ট ছোট ছেলেপিলে আগলায়;—ছেলেপিলে হওয়া বিরজার এখনও বন্ধ হয় নাই।

মেয়েদের বিবাহ দেওয়াটা বিরজা এখন নিতান্ত আবশ্যক মনে করিল। স্বামীর কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার তার অবসরই হয় না। তা'ছাড়া

উত্থাপন করিলেও তিনি গা করেন না, একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামপ্রসাদী গান ধরিয়া বসেন,—

"মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত,
ঘুরছি আমি অবিরত।"

না হয় গান,

"মা, আমি কি দুখেরে ডরাই।
দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে মা, বাজার মিলাই।"

বিরজা সুন্দর পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইত। মনে মনে বলিত "ওঁর কি এখন এসব কথায় মন বসবে, আমারই অন্যায় ওঁকে এমনি করে বিরক্ত করা।" সে তখন নিজেই মেয়ের জন্য বর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

মেয়ে দুটী ছিল অসামান্য রূপসী। তাদের ভাগ্যের জোরে, তাহাদের বারো বছর পার হইতে না হইতেই বিরজা তাহাদিগের খুব ভাল বিবাহ দিল। একটির বিবাহ হইল জমীদারের ঘরে, আর একটি বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে বউ হইয়া গেল। তাহাদের কাহাকেও কিছু দিতে হয় নাই, তবু দুই মেয়ের বিবাহ দিতে বিরজার সমস্ত গহনা ও পুঁজির অর্দ্ধেক টাকা নিঃশেষ হইয়া গেল।

পত্নীর চেষ্টায় দায়মুক্ত হইয়া প্রাণকুমার বলিল, "তারা তোমার ইচ্ছা!" আর গাঁজার কল্কে ফুঁকিয়া নিঃশেষ করিয়া দিল।

হঠাৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রাণকুমারের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। ইহার গুপ্ত কারণ এই যে তাহার যে হাত যশের খ্যাতিতে সে এতদিন করিয়া খাইতেছিল, সে হাতযশ তার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন আর সে রোগী হাতে লইলেই আরাম হয় না। বরং দুই চারিটা জায়গায় রোগীর অবস্থা

খারাপ হইলে যাহারা মহকুমা হইতে বড় ডাক্তার আনাইয়াছিল, তাহারা প্রাণকুমারকে গালাগালি করিয়া গিয়াছে, কেননা সে গুরুতর ব্যাধি চিনিতে না পারিয়া অবহেলা করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া দিয়াছে। এইরূপ নানা কারণে চিকিৎসা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে বলিল, চিকিৎসা করিয়া পয়সা লওয়া অতি হীন কাজ, ইহা সে করিবে না।

বিরজা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল, "তা হ'লে খাবে কি?"

আকাশের দিকে চাহিয়া প্রাণকুমার বলিল, "মা জানেন।" এতদিনও তিনিই চালিয়েছেন, এখনও তিনি চালাবেন।"

বিরজার মনে একটা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিল। এতদিন সংসার করিয়া সে কোনও দিনই "মা তারা"কে আসিয়া সংসার চালাইতে চালাইতে দেখে নাই, বিরজা নিজে অক্লান্ত পরিশ্রমে অশেষ চেষ্টায় সংসার চালাইয়া আসিয়াছে। কাজেই মায়ের সংসার চালাইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তার ভীষণ অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল। সে দিন সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিল।

"তারা ব্রহ্মময়ী মা," বলিতে বলিতে প্রাণকুমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পশ্চিম হইতে সে একটা তানপুরা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা বগলে করিয়া বাহির হইল। সেদিন সে আর ফিরিল না। এক সপ্তাহ বাদে সে ফিরিয়া বিরজার হাতে কুড়িটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দেখ, মা চালায় কি না।"

এই টাকা তার সঙ্গীত বিদ্যার উপার্জ্জন। এ কয়দিন এ অঞ্চলের বড়লোকদের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণকুমার গান করিয়া এই দক্ষিণা লইয়া আসিয়াছে। তার মনে আশা হইল, এমনি করিয়াই সে সংসার চালাইতে পারিবে।

দত্ত-গিন্নী তার ছেলেকে, অর্থাৎ বিরজার ছেলেকে সদরে পাঠাইলেন স্কুলে পড়িতে। বিরজার বড়ছেলে তার চেয়ে দুই বছরের বড়, তবু সে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িয়া রহিল। তার তৃতীয় পুত্রেরও প্রায় স্কুল যাইবার বয়স হইয়া উঠিল। বিরজা মাথায় হাত দিয়া বসিল, কেমন করিয়া ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

দত্তক গ্রহণ করিবার সময় দত্তমহাশয় ও দত্তগিন্নী দুজনেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁরা বিরজার সবগুলি ছেলেপিলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। বিরজা ছেলে দিয়া অবধি সে বাড়ীমুখো হয় নাই, দত্তগিন্নীর কাছেও কোনও জিনিস কথনও লয় নাই, বরং তার ধারের টাকা সে শোধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ সে ছেলের শিক্ষার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কোনও কিনারা করিতে না পারিয়া দত্তবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

দত্তগিন্নী আকাশ হইতে পড়িলেন—এমন দায় তাঁরা কেন লইতে যাইবেন? আজকাল একটা ছেলে মানুষ করার যা' খরচ, তাতেই তো তাঁদের হিমসিম খাইতে হইবে, তাঁরা বিরজার ঐ রাবণের গুষ্ঠি পুষিবেন কোথা হইতে। দত্তগিন্নীর সপক্ষে একথা বলিতে হয় যে, দত্তক গ্রহণের পর হইতে বিরজা আরও তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। নিজের ছেলেদের রাবণের গুষ্ঠি বলায় বিরজার রাগ হইল। মনে মনে সে বাছাদের ষাট্ ষাট্ বলিয়া দত্তগিন্নীকে মনের ঝাল মিটাইয়া একচোট বকিয়া গেল। জীবনে সে কোনও দিন কাহারও সঙ্গে কোন্দল করে নাই, কিন্তু আজ দত্তগিন্নীর সঙ্গে সে এমন ঝগড়া করিয়া আসিল যে, কোন্দল করাই যেন তার আজন্মের ব্যবসা।

ইহার পর সে জমীদার-বধু মেয়ের কাছে লিখিল। তাহাদের গ্রামে একটা এণ্ট্রান্স স্কুল আছে, সেখানে দিদির বাড়ী থাকিয়া ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা হয় কি না জিজ্ঞাসা করিল। মেয়ের শ্বশুর শুনিয়া ক্ষেপিয়া

উঠিলেন; মেয়ের শাশুড়ীর কাছে বড় গলায় বলিলেন, "এই জন্যেই তো আমি গরীবের ঘরের মেয়ে আনতে চাই নি। তা তুমি একেবারে রূপ দেখেই গলে' পড়লে! এসব হ'বে টবে না, বৌমাকে বলে' দাও সে স্পষ্ট করে লিখে দিক এখানে আর কারও স্থান হ'বে না। একটি একটি করে সে রাবণের গুষ্ঠী যে এসে জুড়ে বসবে এখানে সে হ'বে না।"

শুনিয়া লীলা কাঁদিয়া ভাসাইল। তার শাশুড়ী আসিয়া তাকে স্নিগ্ধ বাক্যে ঠাণ্ডা করিয়া বলিলেন, "তুমি লিখে দাও বউমা, আমাদের এখানে ছেলেদের থাকার বড় অসুবিধা হ'বে। তিনি ছেলেদের ওখানকার স্কুলেই পাঠান, তুমি তোমার মাকে তাদের পড়ার খরচ বাবদ দশবারোটা করে' টাকা মাস মাস দিও। আমি ছেলেকে বলে দেবো, সে কর্ত্তাকে লুকিয়ে টাকাটা মাস মাস পাঠিয়ে দেবে।"

লীলা তাহাই লিখিল। বিরজা তার চিঠি পড়িয়া সত্য কথাটা আঁচ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তবু এ দান তাহার গ্রহণ করিতে হইল। দুটি ছেলে বিরজা কাঁদিয়া কাটিয়া সহরে পাঠাইল। দ্বিতীয় মেয়ে উৎপলের বাড়ী সহর হইতে চার মাইল দূরে, বিরজা তার শ্বশুরকে লিখিয়া বন্দোবস্ত করিল; ছেলে দুটি উৎপলার বাড়ীতে থাকিয়া খাইবে আর চার মাইল হাঁটিয়া রোজ স্কুল করিবে।

কাঁদিয়া কাটিয়া মানের মাথা খাইয়া বিরজা কোনও মতে সংসারে টিকিয়া রহিল—তার একমাত্র সুখ ও তৃপ্তির আকর ছিল স্বামীর প্রশান্ত হাস্যোদ্ভাসিত সুন্দর মুখ ও ঋষিতুল্য মূর্ত্তি।

এ সুখও তার বেশী দিন রহিল না। কয়েক বৎসর পর প্রাণকুমার এক দিন বলিয়া বসিল, সংসারে থাকিয়া সাধন ভজনের কিছুই সুবিধা হইতেছে না। সে আর বাড়ী থাকিবে না।

বিরজা তাহার পায়ের উপর আছাড়িয়া পড়িল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে তার পা ভিজাইয়া দিল। সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। স্বামী তাহাকে ভাসাইয়া দিলে সে কোথায় দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া কূল পাইল না।

কিন্তু প্রাণকুমার চলিয়া গেল। কিছু দিন কাঁদিয়া কাটিয়া বিরজা সংসারে স্থির হইয়া বসিল ; তার যে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে মানুষ করিতে হইবে, আরও একটি বাড়ন্ত মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে।

যে বড় ছেলের শিক্ষার জন্য বিরজা এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পড়াশুনা শেষ হইয়া গেল। সে আসিয়া বাপের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া থিয়েটার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া বিরজা তাহাকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেরেস্তার গোমস্তা করিয়া দিল—সে পাঁচ টাকা মাহিনা এবং চলন সই গোছের উপরি পাইয়া সংসার চালাইতে লাগিল। কোথাও থিয়েটার হইলেই তার কাজে গাফিলি হইত, নচেৎ সে কাজ-কর্ম্ম মন্দ করিত না। আর ছেলেগুলি টুকটাক করিয়া কোনও মতে পড়াশুনা চালাইতে লাগিল।

বিরজার তৃতীয় পুত্র যখন ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় প্রাণকুমার একদিন চিমটা ও তানপুরা হাতে করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিরজার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে ভক্তি ও আনন্দে আপ্লুত

হইয়া অশ্রুমুখে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল, প্রাণকুমার আকাশের দিকে চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সুস্থির হইয়া প্রাণকুমার নিভৃতে বিরজাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বিরজার মুখ নব বধুর মত লজ্জায় ও আনন্দে লাল হইয়া উঠিল। সে ছেলেপিলেদের সরাইয়া দিয়া স্বামীর ঘরে গিয়া আস্তে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

বিরজার সে রূপ নাই, যৌবন বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। রোগা কাঠির মত শরীর ও শুষ্ক মলিন মুখ লইয়া অমন সুন্দর স্বামীর কাছে যাইতে সে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। গরীব পূজারি যেমন তার পূজার আয়োজনের দীনতা অনুভব করিয়া দেবতার কাছে সঙ্কুচিত হয়, তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া বিরজা স্বামীর পায়ের কাছে গিয়া বসিল। একথা তার একবারও মনে হইল না যে রূপ যৌবন সে সবই তো এই দেবতার সেবায় সে বিলাইয়া দিয়াছে; স্বামীকে সুখে রাখিবার জন্য সে আপনি না খাইয়া হাড় কালি করিয়া খাটিয়া সে রূপ নষ্ট করিয়াছে। তার কেবলি মনে হইল সে তার স্বামীর কি অযোগ্য।

প্রাণকুমার ধূম পান করিতেছিল। বিরজা আসিলে হুঁকাটি তাকে রাখিতে দিল, তার পর বিরজাকে সম্মুখে একটু তফাতে বসিতে বলিল

বিরজা একটু দমিয়া গেল, কিন্তু স্বামীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে বসিল।

প্রাণকুমার বলিল, "শৈলিটা তো দেখছি দিব্যি ডাগর হ'য়ে উঠেছে। ওর তো এখন বিয়ে না দিলে নয়।"

শৈল বিরজার তৃতীয়া কন্যা, বিরজা স্বামীর বিবাহে এতটা আগ্রহ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। সে বলিল, "হাঁ তা তো বটেই।"

প্রাণ। আমি ওর বিয়ের একরকম জোগাড় করেছি। ছেলেটির

ঘরে খাবার আছে, লেখাপড়া কিছু হয় নি, মালিহাটার জমিদার বাড়ীতে সুমারনবিশি করে।

বি। লেখাপড়া জানে না? আমার বড় সখ এই শেষ মেয়েটি লেখাপড়া জানা বরের হাতে দিই।

প্রাণ। তা' পাচ্ছই বা কোথায়, আর পেলেই বা দিয়ে লাভ কি। কত শত বি-এ পাশ ছোকরা তো এই নায়েবী পেলে বর্ত্তে যায়।

বি। নায়েবী! তুমি না বল্লে সুমারনবিশ।

প্রাণ। হাঁ হাঁ, তা' নায়েব সে হ'ল বলে। তার বাপ একটা ডিহির নায়েব। সে ম'লেই ছেলে নায়েব হ'য়ে বসবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিরজা বলিল, "আচ্ছা, তা যদি ভাল বোঝ তো মন্দ কি? তা', তাকে দিতে হ'বে কত?"

প্রাণ। সেদিকে আছে। নগদ হাজার টাকা আর পাঁচশো টাকার গয়না।

বিরজা উল্লসিত হইয়া বলিল, "তাই নাকি, এত টাকা কোথায় পেলে?"

প্রাণকুমার হাসিয়া বলিল, "পেলাম তোমারই গুণে! এতগুলি সুন্দর সুন্দর ছেলে বিইয়েছ ব'লে।"

বিরজা চমকিত হইয়া উঠিল। প্রাণকুমার বলিয়া গেল, "মালিহাটির জমীদারের ছেলেপিলে নাই, তিনি আমার একটি ছেলেকে পুষ্যি নিতে চান। বড়ই পীড়াপীড়ি করলেন, আমাকে দু' হাজার টাকা দিতে চাইলেন। আমি বল্লাম, ছেলে দিয়ে টাকা নিলে তো দত্তক অবৈধ হবে। তাই তিনি আমাকে আমার গান শুনে পাঁচশো টাকা বখ্শিষ দিয়ে দিলেন, আর হেসে বল্লেন, যে ছেলে নিয়ে গেলেই আরও গান শুনে বখ্শিষ দেবেন। তাই আমি ছোটটাকে নিতে এসেছি।"

এমন হাসিমুখে প্রাণকুমার কথাটা বলিয়া গেল যে বিরজা স্তম্ভিত হইল। তার সুন্দর স্বামী তার চোখে ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

প্রাণকুমার কি জানি কেন বিরজার মুখের দিকে চাহিতে ভরসা হইল না। সে আকাশের দিকে চাহিয়া দাড়িতে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "আর একহাজার টাকা পেলাম, সিরাজগঞ্জের চৌধুরী বাড়ীতে। তাঁরা আমার বড় ছেলেকে ঘরজামাই ক'রতে চান। বিয়ের সমস্ত খরচা তাঁদের, তার উপর এক হাজার টাকা আমাকে দেবেন, ছেলের নামে তিন হাজার টাকা লিখে দেবেন। সেখান থেকেও একহাজার টাকা নিয়ে এসেছি। এখন এই দুটো ছেলে পার ক'রলেই শৈলির বিয়ের আর কোনও চিন্তা থাকে না।"

বিরজা কেবল বলিল, "মেয়েকে বরং আমি দড়ি কলসী দিয়ে ঘাটে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" সে আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। এই তার স্বামী! এমন অপদার্থ, এমন ভয়াবহ; স্বামীর রূপই যেন তার কাছে এখন সব চেয়ে ঘৃণার বিষয় হইয়া উঠিল। কি সব সর্ব্বনেশে কথা বলে হতভাগা। তার মন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া উঠিল।

প্রাণকুমার একটু উষ্ণভাবে বলিল, "এ না হ'লে বলে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি! তোমার একটু অগ্র-পশ্চাৎ ভাববার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি তো তোমার মত অমন বেপরোয়া হ'তে পারি না, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, ছেলে মানুষ করবার ভাবনা আমার ভাবতে হয়। অনটনের সংসারে থেকে তো তোমাদের পেট চলাই দায়, এতে ছেলেদের মানুষই বা করবে কেমন করে, আর মেয়েরই বা বিয়ে দেবে কেমন করে।"

বিরজা ক্ষেপিয়া উঠিল। আজ টাকার লোভে প্রাণকুমারের ছেলে মানুষ করা ও মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবিতে হইতেছে। কিন্তু এ

ভাবনা কোথায় ছিল আর দুটি মেয়ের বিয়ের বেলায় ? তার সমস্ত অন্তর বিষে জর্জ্জর হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বলিল, "যেমন করে এতদিন ক'রেছি তেমনি করে করবো। যেমন করে তোমাকে প্রায় মানুষ করে তুলেছি যেমন করে ওই অপদার্থ পেট এতদিন ভরিয়েছি তেমনি করে ক'রবো। ছেলে বেচতে হয় আমি বেচবো। কোনও দিন তুমি তাদের মুখের দিকে চাও নি, তুমি এসে তাদের বেচতে স্পর্দ্ধা করো না।"

বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরে গিয়া সে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হা, অদৃষ্ট, এমন মাকাল স্বামী দিয়া ভগবান তাহাকে ঠকাইয়াছেন! এমন চাঁদের মত ছেলে পিলে দিয়াছেন, কিন্তু তাদের পেট ভরিবার সঙ্গতি দেন নাই। তাই সে চারিদিকে অপমান হজম করিয়া এমন দুঃখে দিন কাটাইতেছে; আর শেষ কি না তার স্বামী তার কাছে এমন প্রস্তাব করিয়া বসিল! সে কাঁদিয়া কূল পাইল না।

আরও দুই একবার এ সম্বন্ধে কথা তুলিতে, প্রাণকুমার বিরজার কাছে এমন অপমানিত হইল যে সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বিরজাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। চিমটা তানপুরা এবং নোটের তাড়া সঙ্গে লইতে ভুলিল না। আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

সিরাজগঞ্জের চৌধুরীরা প্রাণকুমারকে পুত্রের বিবাহ ব্যয়ের অগ্রিম খরচা বাবদ টাকা দিয়া সেই মর্ম্মে এক হাজার টাকার একখানা রসীদ লিখাইয়া লইয়াছিল। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তাহারা নালিশ করিল। প্রাণকুমারের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না, একতরফা ডিক্রী অনায়াসে হইয়া গেল। ডিক্রীজারীতে বিরজার ভিটেটুকুও গেল। ছেলে মেয়েদের হাত ধরিয়া সে পথে দাঁড়াইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সে মরিয়া হইয়া এক বুদ্ধি

ঠিক করিল। বড় ছেলেকে ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে রাখিয়া সে তার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে লইয়া মালিহাটিতে উপস্থিত হইল। সেখানকার জমীদার বাড়ী গিয়া গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

গৃহিণীর পা' ধরিয়া কাঁদিয়া সে বলিল "মা আমি আজ নিরাশ্রয়। চিরজীবন দুঃখে কষ্টে, শরীর খাটিয়ে খেয়ে এসেছি, কেবল স্বামীর ভিটেটুকু ছিল বলে,—এখন আমায় পথে দাঁড়াতে হয়েছে। আমায় আপনার পায় একটু আশ্রয় দিন। আপনি আমার একটি ছেলে চেয়েছিলেন। সব কটিকে আপনি নিন, আপনি ওদের মানুষ করুন, ওদের আপনার পেটের বলে মনে করুন—কেবল মা আমার দুখিনীর সম্বল 'মা' ডাকে আমায় বঞ্চিত ক'রবেন না।"

গৃহিণী সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তাহাকে বসাইয়া স্বামীর কাছে গেলেন। বিরজা আশ্রয় পাইল। তার ছেলেরা জমীদারের ছেলের মত মানুষ হইল। শৈলির বড় ঘরে বিবাহ হইল।

* * * * *

পশ্চিম ভারতে কোনও সহরে একটি শিবালয়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। শিবালয়টি এতদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, এক পূজারী সামান্য দেবত্র ভোগ করিত ও পূজা আরতি করিত। হঠাৎ তেজঃপুঞ্জ দেবতুল্য এক সন্ন্যাসী আসিয়া শিবালয়ে আস্তানা গাড়িলেন। সন্ন্যাসী যেমন সুন্দর তেমনি সুগায়ক এবং সুচিকিৎসক। তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি ধাঁ ধাঁ করিয়া বাড়িয়া গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে শিষ্য সেবক আসিয়া তাঁর চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁর যোগাসনের নীচের গর্ত্তে স্থিত বৃহৎ সিন্ধুকটি সোনা রূপা ও নোটে ভরিয়া উঠিল।

দলে দলে শিষ্য আসিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। তিনি তাঁহাদের দীক্ষা দিলেন, অনেককে তিনি ঔষধ ও মাদুলী দিলেন।

সন্ন্যাসী বেশীর ভাগ সময় ধ্যানস্থ থাকেন। ভক্তের পর ভক্ত আসিয়া তাঁর চরণে প্রণত হইয়া যায়, তিনি চক্ষু মেলেন না। কেবল সুন্দরী যুবতী তাঁহার পাদবন্দনা করিলে তিনি তাহাকে দৃষ্টি দান করিয়া সম্মানিত করেন।

এই মহাযোগী—প্রাণকুমার;—চৌধুরীরা ফৌজদারী করিবে এই মিথ্যা আশঙ্কায় সে-দেশত্যাগী!

সৃষ্টিছাড়া

১

সৃষ্টিছাড়া বলিয়া ভবেশ রায়ের একটা অখ্যাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

সে ছিল বাপের এক ছেলে। তার সম্পত্তি যা ছিল তাতে তার একার স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। সে যখন স্কুলে পড়িত তখন তার মাষ্টারেরা তাকে ভালছেলে বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। ছেলে মহলেও তার প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না, কিন্তু তার একটা দোষ ছিল সে বড় ঝগড়া করিত, তাই সে বাস্তবিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। সে নিজে যেটাকে ভাল মনে করিত তাহা হইতে একচুল এদিক ওদিক সহ্য করিতে পারিত না; আর কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধ কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কাজেই খুব বেশী দিন তার কারও সঙ্গে সদ্ভাব থাকিত না।

সে স্কুলে পড়িবার অবস্থায়ই তার বিবাহ হইল একটা মেয়ের সঙ্গে যার তুল্য সুন্দরী সে পরগণায় কেউ ছিল না। তখন তার বয়স ষোল বছর এবং স্ত্রী মাধুরীর বয়স বার কি তের। তারপর আরও দুই বছর ভবেশচন্দ্র তাঁতির মাকুর মত ঘর ও স্কুলে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাঁশবন হইতে সাত মাইল দূরে স্কুল, বোর্ডিংএ থাকিয়া সে পড়ে, প্রতি শনিবার বাড়ী আসে, সোমবার ভোরে যায়। মাঝে মাঝে এটা ওটা অছিলা করিয়া আরও দুই একদিন বেশী বাড়ীতে কাটায়।

দুই বৎসর ধরিয়া বোর্ডিংএর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্তের ভয়ানক নিন্দা করিয়া শেষে ভবেশ প্রস্তাব করিয়া বসিল যে সে বাড়ী হইতেই

স্কুলে যাতায়াত করিবে, কেবল একখানা বাইসিকেল হইলেই হয়। তখন পর্য্যন্ত সে অঞ্চলে বাইসিকেল বিশেষ কেহ দেখে নাই। একদিন সদর হইতে মহকুমার ডেপুটি বাবু বাইকে আসিয়াছিলেন, তাই দেখিবার জন্য সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বাইসিকেলে যে খুব অসাধ্য সাধন করা যায় এ কথা সবাই বুঝিয়াছিল, তাই এ কথায় ভবেশের মা অপ্রসন্ন হইলেন না। ছেলেটা যে বোডিংএর অখাদ্য খাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে সেটা তাঁর সহ্য হইত না। একটা বাইসিকেল হইলেই যদি তার বাড়ী হইতে আনাগোনা করা চলে তবে সে তো আনন্দেরই কথা। আর সে বোর্ডিংএর খাওয়া দাওয়ার কথা শুনিয়া তাঁর নিজের অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া আসে—তাঁর আদরের দুলাল ছেলে কি করিয়াই বা সেখানে থাকে। সেখানে নাকি ডাল কম পড়িলে জল মিশাইয়া অজস্র পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। আবার রান্নার এমন সুব্যবস্থা যে প্রায়ই নাকি ডালের ভিতর ব্যাঙের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। ভাত সে যেন অর্দ্ধেক চাল অর্দ্ধেক কাঁকর। তরকারী, সে ম্যানেজার বাবু এক কচু চিনিয়া বসিয়া আছেন, কচু ছাড়া কোনও তরকারীই হয় না। এমনি সব কথা। এর মধ্যে ছেলে থাকেই বা কি করিয়া!

কাজেই বাইসিকেল কেনা হইল। মায়ের একখানা গহনা তাতে বেচিতে হইল, তা বিধবা মা, তাঁর গয়নার প্রয়োজনই বা কি? ছেলে যে রোজ সন্ধ্যায় গলদঘর্ম্ম হইয়াও বাড়ী ফিরিয়া আসে এই আনন্দেই মা নিজের গহনা বিক্রী হাজার গুণে সার্থক বিবেচনা করিলেন।

রোজই যে ভবেশ বাড়ী ফিরিত এমন কিছু নয়। এই ধর, যখন মাধুরী বাপের বাড়ী যাইত তখন ভবেশকে বাঁশবনের ধারে কাছেও বড় দেখা যাইত না। তার বাইসিকেলখানি রোজ উল্টা পথে শ্বশুর বাড়ী যাতায়াত করিত, এবং প্রায়ই শাশুড়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে দুই চার দিন

সেখানে থাকিয়া যাইত। ছেলের মুখ খানা না দেখিয়া সে কয়দিন মায়ের প্রাণ ছটফটাইয়া উঠিত; তবু মা ছেলের মন বুঝিতেন ও মনে মনে হাসিতেন। তার মনে পড়িত অনেক দিনের পুরাতন কথা যখন ভবেশের বাপও এমনি করিয়া তাঁর চারিদিকে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইতেন। মনে পড়িত যে তরুণী ভবেশের মা তাঁর ভালবাসার অত্যাচারে কি বিব্রত হইয়া পড়িত, লোকের কাছে লজ্জা পাইয়া কি নাকাল হইয়াছে, আর নাকাল হইয়া সে স্বামীকে এক একদিন কি নির্দ্দয় বকুনি দিয়াছে। আজ বিধবার মনে পড়িত, সেই তরুণ স্বামীর করুণ মুখ, তাঁর বেদনা ভরা পীড়িত চক্ষু—আজও সে কথা ভাবিতে তাঁর হৃদয় সেই প্রাচীন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। তিনি মনে মনে বলিতেন, "আহা বাট, বাছা আমার যেন তেমন ব্যথা না পায়।" চাঁদের মত ছেলে যে চাঁদের মত বউ পাইয়া তাকে ভালবাসে আর বউও যে সে ভালবাসা সুদশুদ্ধ প্রতিদান দেয় এ কথা ভাবিতে মায়ের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত।

এমন করিয়া ভবেশের বেশী দিন কাটিল না। রোজ চৌদ্দ মাইল বাইসিকেলে যাতায়াত করিয়া তার পেটে একটা ব্যথা ধরিল। কোনও দিনই তার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল না, এখন সে আরও রোগা হইয়া উঠিল। সে ঔষধ খাইতে লাগিল।

রোজ বাইসিকেল করিয়া সাত মাইল দূরে স্কুলে যাতায়াত করা যে অসম্ভব সে বিষয়ে কবিরাজ মহাশয়, ডাক্তার বাবু, ভবেশ, তার মা ও মাধুরী সম্পূর্ণ একমত। বোর্ডিংএ ফিরিয়া যাওয়াও যে একেবারেই অসম্ভব তাহার সম্বন্ধে ভবেশ ও তার স্ত্রীর এক মত। মাধুরী লজ্জায় এ মতে সাড়া দিতে পারিল না, কেন না এটা যে বড্ড স্বার্থপরের মত শোনায়। উদ্ভাবনা-পটু ভবেশ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া লোকে মানুষ হয় না; বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া

জাহান্নমে যায়। যেকালে অন্নবস্ত্রের অভাব নাই তখন তার ইংরাজী পড়ার কিই এমন প্রয়োজন? সে সংস্কৃত পড়িবে এবং কবিরাজী শিখিবে।

মা এ প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। তাঁর মনে হইল যে তাঁর বাপের বাড়ীর একটি ছোকরা ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছে—সেটা যে ইংরাজী পড়ারই ফল তাতে সন্দেহ নাই। তাঁর ছেলে যদি হঠাৎ ব্রাহ্ম-ট্রাহ্ম হইয়া যায় তবে কি অনর্থ হইবে! তার চেয়ে সংস্কৃত পড়িয়া ধর্ম্মে মতি রাখিয়া মানুষ হ'ক, বাপের একছেলে সে, তার অন্ন বস্ত্রের তো অভাব নাই!

মাধুরী এ প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইল। এ প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভবেশ যে গ্রামেই ভট্টাচার্য্যের মহাশয়ের কাছে পড়িবে এবং দিন-রাতই যে তার সঙ্গে দেখা হইবে এ কথা ভাবিতে তার এত আনন্দ ও এত লজ্জা হইল যে সে আর কথা বলিতে পারিল না। একবার তার মনে হইল বটে যে তার চিরদিনের স্বপ্ন ছিল যে তার স্বামী তার ভগ্নীপতির মত এম-এ পাশ হইবে। তাহা না হওয়ায় মনের ভিতর একটু ছায়া দেখা দিল। কিন্তু স্বামীর নিত্য সংসর্গের আনন্দের সামনে সে ক্ষুদ্র ছায়া বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না।

এমনি করিয়া ভবেশ রায় গ্রামে আসিয়া বসিল। তার এণ্ট্রান্স পাশ করা হইল না। ঘরে না বসিলেও হইত কি না সন্দেহ; কেন না বিবাহের পর হইতে তার সুন্দরী স্ত্রীর মুখখানা তাকে এমন ভয়ানক আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে সে স্কুলে বা বোর্ডিংএ কোথাও বসিয়া কখনও অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। কাজেই বিফল পরীক্ষায় জীবনটাকে শুকাইয়া না ফেলিয়া সে যৌবনের আরম্ভ হইতেই জীবনের রস পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে মনোনিবেশ করিল।

বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। বাড়ীতে অন্য লোক ছিলেন না কেবল ছিলেন মা। সে বেচারী তো ছেলে বৌর মুখের দিকে চাহিয়াই

আনন্দে অধীর। তাদের উপর তার কোনও দাবী দাওয়া ছিল না। তাই ভবেশ মাধুরীর সঙ্গে দিনরাত পরমানন্দে কাটাইতে লাগিল। মাধুরী রান্না করিতে গেলে সে কাষ্ঠ আনিয়া দিত, উনান ধরাইয়া দিত, ভাতের হাঁড়ি নামাইত, ঘর নিকাইতে বসিলে জলের ঘটি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, তার হাত ধুয়াইবে বলিয়া। কুটনা কুটিতে বসিলে ভারী ভারী কুমড়া কাটিয়া দিত। এমনি করিয়া সে সব কাজের মধ্যে মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত আর চাহিয়া থাকিত, কথা কহিত, সোহাগ করিত—কথা আর তাদের ফুরাইত না।

মাধুরীর সখীরা হার মানিয়া গেল, একদণ্ড তারা তাকে পায় না। ভবেশের বন্ধুরা তাহাকে ইস্তাফা দিল; তাহাকে বাহিরে তো দেখাই যায় না, বাড়ীতে আসিয়াও ঘণ্টা খানেক হাঁকাহাঁকি করিয়া শেষে হয় হেঁসেল, না হয় ভাঁড়ার, না হয় শুইবার ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হয়। দুই-দশ দিন বিপুল উৎসাহে তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে তাহারা হাল ছাড়িয়া দিল।

কথা ছিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে ভবেশ পড়িবে। সে বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও ভবেশের সমান উৎসাহ ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একখানা পুরাতন কলাপ ব্যাকরণ দিলেন এবং রোজ সকালে আসিতে বলিলেন। কিন্তু অনধ্যায় সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রের সকল খুঁটি নাটি বিধি বাছিয়া এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিষয় কর্ম্ম আড্ডা প্রভৃতির সময় বাদ দিয়া পড়াইবার অবসর বড় হইয়া উঠিত না। আর যখন ভট্টাচার্য্যের অবসর হইত তখন ভবেশ হয় তো মাধুরীকে লইয়া এত ব্যস্ত যে তাহার হাজির হইবার সময় হইত না। কলাপ ব্যাকরণ কুলুঙ্গীর উপর পোকায় খাইতে লাগিল।

২

ভবেশ বাড়ী থাকে খায় দায়, আর পরিপূর্ণরূপে আপনাকে মাধুরীর চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখে। তার এই জীবনব্যাপী মহাযজ্ঞের মধ্যে একমাত্র ব্যসন ছিল গৃহকর্ম্ম; সেও তার সেই যজ্ঞেরই একটা পরোক্ষভাগ। সে বাজারে যায় ঘরের কাজ করে, "পালান" করিয়া তরীতরকারী জন্মায়, ঘরের বেড়া বাঁধে, ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, সব কাজে সঙ্গে সঙ্গে থাকে—হয় মাধুরী নয় তার চিন্তা। বেড়াটি বাঁধিয়া তার মনে হইত যে মাধুরী তার কাজের নিপুণতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে. ঘর ঝাঁট দিয়া, সামান্য আসবাব পত্র নাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সে ভাবিত মাধুরী দেখিয়া কত না সুখী হইবে। ফুলের গাছ পুতিয়া মনে করিত ফুল তুলিয়া মাধুরী মালা গাঁথিয়া হয় তো তাহাকে মালা পরাইয়া দিবে। এমনি তার সব কাজের সঙ্গেই মাধুরীর সংযোগ ছিল। যেখানে সংযোগ ছিল না সে কাজে তার কোনও রস ছিল না। তাস খেলিতে বসিয়া সে শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিত। মাছ মারিতে তার এক ফোঁটাও উৎসাহ ছিল না। যাত্রা গান শোনাটা সে রীতিমত ঘৃণা করিত, এমনি বাজে কাজে রাত্রিটা নষ্ট করা কোনও কাজেরই কথা নয়।

একটি মাত্র ব্যসনে সে মাঝে মাঝে নিজকে নিযুক্ত করিত—সে মোড়লী করা। গ্রামে যদিচ অনেকগুলি প্রবীণ লোক ছিলেন, তবু ভবেশ সব বিষয়ে তাঁদের মতামত মাথা পাতিয়া লইতে পারিত না। আর সে একটু বেয়াড়া ভাবে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিবাদ করিত। তবু ঠিক মোড়লী করাটার অবসর তার সাধারণতঃ ছিল না, বাড়ীর বাহিরে

বেশীক্ষণ সে থাকিতে পারে কই ? কেবল একটা ব্যাপারে সে খুব জোরের সহিত মোড়লী করিয়াছিল—সে দত্ত গিন্নীকে লইয়া।

শরৎ দত্তের স্ত্রী গ্রামের মধ্যে ডাক সাইটে অসতী ছিলেন। গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা এতই জানাজানি হইয়া গিয়াছিল যে, শরৎ দত্ত মহাশয়ের অসাক্ষাতে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দ আলোচনা ও ইহা লইয়া রঙ্গ রহস্য করা একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দত্ত গিন্নি যে কেবল অসতী তাহা নন, স্বামীর প্রতি ভীষণ অত্যাচারী।

আর সকলে ইহা লইয়া হাসি তামাসা করিত কিন্তু ভবেশ চটিয়া আগুন হইত। দাম্পত্য সম্বন্ধের সম্বন্ধে তার ধারণা মাধুরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধের ভিত্তির উপর গাঁথা, কাজেই সে তার সূক্ষ্ম রেখাটির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বরদাস্ত করিতে পারিত না। কাজেই দত্ত গিন্নি যে গ্রামের বুকের উপর বসিয়া এত বড় পাপ কার্য্য করিবে, পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের এত বড় অপমান ঢাক বাজাইয়া করিবে, সে তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।

এই এক ব্যাপারে সে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া অনেকটা সময় এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরিয়া ঝোট পাকাইয়া ব্যয় করিল, উদ্দেশ্য দত্ত-গিন্নিকে উপযুক্ত রূপে শাস্তি দেওয়া। সে দেখিতে পাইল তার সঙ্গে সকলেই এক মত। সে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই সকলে ঘাড় নাড়িয়া বলে, "তা' বটে, এ সম্বন্ধে একটা কিছু না ক'রলে আর তো চলে না। সমাজ যে ছার খারে গেল।"

সবার কাছে সহানুভূতি পাইয়া সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। চৌধুরী বাড়ীর বিবাহের নিমন্ত্রণে সে কথাটা উঠাইয়া একটা মহা হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া লইল। ক্রমে একটা বৈঠকে অনেকে বসিয়া ঠিক হইল যে দত্তমহাশয় যদি দত্তগিন্নিকে ত্যাগ না করেন তবে তিনি 'একঘরে' হইবেন।

এই সংকল্প করাইয়া সে মহা আনন্দে ঘরে ফিরিল। তাহার সফলতার সংবাদ শুনিয়া মাধুরী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—কেন না এ একটা গৌরব এবং সতীত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা পরিচয়। সে বলিল, এ তো চাইই। দত্ত-গিন্নি সতীত্বের মাথায় বাড়ি দিয়েও যদি সমাজে এমনি টিকে যায়, তবে আর মেয়েরা সতী হ'তে যাইবে কি সে? ধর্ম্ম যে জাহান্নমে যাবে।"

ভবেশেরও সেই মত; কিন্তু ঠাট্টার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। সে বলিল "তাই না কি? যদি দত্ত-গিন্নিকে 'একঘরে' না করা হ'ত তবে বুঝি তুমি গিয়ে তার সাকরেত হ'তে।

"যাও কি যে বক তার ঠিক নেই। আমার কথা কে ব'লছে?"

"কেন এই তুমিই তো বল্লে? এত বড় অসতীর যদি সাজা না হয় তবে সতী হ'বার দরকার কি? তুমি তা'হলে সতী থাকবে কেন?"

"আহা তাই বুঝি আমি বল্লাম। আমি বল্লাম যে অনেকেই তো তাহ'লে অসতী হ'য়ে যাবে। আমি বুঝি আমার কথা ব'লছি।"

"না, তা' তুমি এমনি আমার মুখের উপর বলে বসতে যাবে কেন, কিন্তু তুমি যা বল্লে তার মানে তো এই?"

"যাও তুমি ভারি দুষ্ট। সবাই আর আমি বুঝি সমান?"

"কেন নও? সবার দুটো করে হাত পা, তোমারও তাই সবারই—"

"খবরদার বলছি, এ কথা ফের বলবে তো আমি—হাঁ—"

"আমি কি?—কি ক'রবে বলে? বলে' ফেল। দত্তগিন্নীর মত চেলাকাঠ নিয়ে আমায় শিক্ষা দিবে?"

"এমন সব কথা ব'লবে তো আমি মরে যাব !"

"এত বড় শাস্তিটা দিও না ; দোহাই ! তা'হলে যে আমি অনাথ হ'ব রাণী।"

কথাটা এমনি করিয়া ক্রমশঃ একটা পরিণতি লাভ করিল, যা' তাদের সকল কথাবার্ত্তার শেষ পরিণতি হইত। ক্রমে আদর সোহাগের কথা হইতে তাহা চুম্বনের ধারায় পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

আপনাকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া মাধুরী হাসিয়া বলিল,—"সত্যি আমি ভাবি কেমন করে' লোকে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কথা ভাবতে পারে ? আমার তো' এ' একেবারে কল্পনায়ই আসে না।"

গোঁফে চাড়া দিয়া গম্ভীর হইয়া ভবেশ বলিল, "তা বিবেচনা করে দেখ, সবার তো আর তোমার মত, এই কার্ত্তিকের মত স্বামী হয় না।"

মাধুরী আদর ভরা চোখে তার সুন্দর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুক ও প্রীতির হাসি হাসিয়া বলিল, "দেখো বেশী দেমাক করো না, শেষে দেমাকে ফেটে যাবে।"

ভবেশ বলিল, "বাঃ দেমাক কি ? হক্ কথা ! ভবেশ রায় কারও ভয়ে হক কথা বলতে থামবে না।"

এমনি করিয়া তাহারা অসতীর শাস্তি উপলক্ষে আনন্দোৎসব করিল।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক যাইতেই ভবেশের সন্দেহ হইল। মাস খানেক পরে সে স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে দত্ত মহাশয় ও দত্ত গিন্নী ঠিক পূর্ব্বের মতই সমাজে চলিয়া যাইতেছেন। ভবেশ সুবার সঙ্গে চটাচটি করিল, স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া আসিল। চৌধুরী বাড়ীর আসরে স্বয়ং কর্ত্তাকে অপমান করিল। সে চৌধুরী মশায়কে শাসাইয়া আসিল যে সে তাঁরও হুঁকা নাপিত, বন্ধ করিবে। তার পর নটবর দাসকে

সে একঘরে করিল। তার পর যোগেন রায়, শশী নিয়োগী, ভূপেন মিত্র, ইত্যাদি করিয়া একে একে সকলে তার হুকুমে এক ঘর হইয়া গেল। বাকী রহিল কেবল মাধুরী ও ভবেশ।

তাতে সে বেশ আনন্দেই রহিল। তার সংসার বলিতেও মাধুরী সমাজ বলিতেও মাধুরী—এ তো তার চিরদিনই ছিল, আজও তাই রহিল। কাজেই সে কোনও অসুবিধা দুঃখ কষ্ট বোধ করিল না। বরং সে যে সবার উপর টেক্কা দিয়া গিয়াছে, সে নিজে যে ধর্ম্মজ্ঞানে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা সবার কাছে বড় গলায় প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছে ইহাতে পরম আনন্দ লাভ করিল।

এসব কথা লইয়া মাধুরীর সঙ্গে রোজই কথা হইত। অন্য লোকের সঙ্গে কথায় সে ধাঁ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিত ক্ষেপিয়া যাইত; কিন্তু মাধুরীর সঙ্গে তার পরিপূর্ণ সহানুভূতি ছিল, তার সঙ্গে সে হাসিমুখেই এসব কথা আলোচনা করিত।

যে দিন সে শেষ ব্যক্তিকে একঘরে করিয়া, আসিয়া ঘরে বসিল সে দিন সে মাধুরীকে বলিল "ওগো যাও, এইবার দত্তগিন্নীর কাছে গিয়ে মন্ত্র নিয়ে এসো।"

মাধুরী কথাটা প্রথম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "সে কি গো? পাগল হলে না কি?"

খুব গম্ভীর ভাবে ভবেশ বলিল, "কেন? তুমি তো বলেছিলে যে এত বড় অসতীর যদি সাজা না হয় তবে তুমি তার সাকরেদ হ'বে।"

"আ, আমার পোড়া কপাল! এ কথা আমি কবে ব'লতে গেলেম! কি যে বল ছাই ভস্ম তার ঠিক নেই।" ক্রমে ভবেশ মাধুরীকে বলিল যে গ্রামের শেষ ভদ্রলোকটীকে সে একঘরে করিয়া আসিয়াছে। "এখন রইলাম কেবল তুমি আর আমি।"

এ খবরটায় খুব একটা আনন্দ হইবার কথা নয়। কিন্তু ভবেশ না কি নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া, আর স্ত্রী তার যোগ্য শিষ্যা, তাই দুজনে এমন ভাবে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হইল যে, যেন এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর হইতেই পারে না।

মাধুরী বলিল, "কলির শেষ হ'য়ে এসেছে। এত বড় অধর্ম্ম কি ভগবানের সইবে? দেখ না কি হয়? গ্রামে আর সতী থাকবে না।"

ভবেশ হাসিয়া সংশোধন করিয়া বলিল, "কেবল তুমি ছাড়া।"

ইহাতে মাধুরী রাগ করিল। তার সম্বন্ধে একথা ওঠে কিসে?

কিছু দিন পর দেখা গেল যে দত্তগিন্নী যাই করুক না তাঁর দৃষ্টান্তে গ্রামের সতীর সংখ্যা হ্রাস হইল না। যে যেমন ছিল মোটের উপর ঠিক তেমনি রহিয়া গেল।

৩

এমনি করিয়া ভবেশের দিন চলিল। সে চিরদিনই এক ঘরে' ছিল এখনও রহিল। তার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে বুঝাইতে আসিল, সে কিছুতেই বাগ মানিল না। এত বড় অধর্ম্মের সঙ্গে আপোষ সে প্রাণ থাকিতে করিতে পারিবে না।

নটবর দাস বলিল, "তুমি তো আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া হে। গ্রাম শুদ্ধ লোক যাকে নিয়ে ঘরবসত ক'রতে চায়, তাকে তুমি উদ্বাস্ত ক'রতে চাও! ভেবে দেখ সেও কৃষ্ণের জীব!"

ভবেশ অটল হইয়া তার জীবন-সাগরে একমাত্র নোঙ্গর স্বরূপ মাধুরীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। যেমন দিন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

কিন্তু তার মাধুরীর সঙ্গে ক্রমে একটু খাদ মিশিতে লাগিল।

বিবাহের বছর তিনেক পর মাধুরী একটি কন্যা প্রসব করিল। স্বামী স্ত্রী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। এক ফোঁটা মেয়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দুইজনের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রেমের জীবনে আনন্দে একটা ভারী রকম জোয়ার খেলিয়া গেল। মেয়েটাকে যে ভবেশের মা আস্তে আস্তে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন তাহাতে যেন তারা দুজনে একটু ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিল—মেয়ে যদি ষোল আনা তাদেরই থাকিত তবেই ভাল হইত।

কিন্তু সে ক্ষতির পূরণ হইল—পরের বৎসর মাধুরী আর একটী কন্যা উপহার দিল। এ বুঝি বড়টির চেয়েও সুন্দর! তরুণ পিতা মাতা আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাদের কাজ অনেক বাড়িয়া গেল, সংসারের

কাজের উপর দুইটি মেয়ের কাজ! কিন্তু আনন্দ যেন আরও দশগুণ বাড়িয়া গেল।

তার পর বৎসর যখন মাধুরী আবার আঁতুড়ে, সেই সময় তার শাশুড়ী হঠাৎ মারা গেলেন। ভবেশ দুটি কচি শিশু লইয়া মা হইয়া বসিল। আর সে মেয়ে কি? এক দণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে জানে না, এক মুহূর্ত্ত তাদের কোল হইতে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই—দিলেই একটা কিছু অনর্থ করিয়া বসিবে।

ভবেশ মাতৃশোকে অধীর, তার উপর তার ঘাড়ে দুটি মেয়ের বোঝা। গ্রামের সবাইকে সে এক ঘরে' করিয়াছে, কাজেই কারও কাছে সাহায্য চাহিবার উপায় নাই।

কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভগ্নী আসিয়া তবু তাহাকে দুই বেলা দুটী রাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। ভবেশ চোখ মুখ বুজিয়া এই ভাবিয়া সে সেবা গ্রহণ করিল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই ভগ্নীটির সতীত্বের খ্যাতি আছে এবং ইনি কোনও রকম প্রত্যক্ষ ভাবে দত্তগিন্নির সহিত সংশ্লিষ্ট নন।

আঁতুড় হইতে বাহির হইয়া মাধুরীও খুব বেশী কাজের যোগ্য হইয়া উঠিল না। অল্প বয়সে পরপর তিনটি সন্তান প্রসব করিয়া তার শরীর অনেকটা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজ করিতে ভারী কষ্ট হইত তবু সে হাসিমুখে কাজ করিত। ভবেশ সব বিষয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিত এবং যতদূর সম্ভব স্ত্রীর সেবা করিয়া, তার পরিশ্রমের লাঘব করিত। ছেলে পিলে তিনটি বেশীর ভাগ তার ঘাড়েই পড়িয়াছিল। পাড়ার লোকে এ কথা লইয়া বলাবলি করিত, "ভবেশ রায়ের সবই সৃষ্টিছাড়া। আহ্লাদ দিয়া দিয়া বউকেও করিয়াছে বাবুটি, সে কালের মেয়েরা ছ'সাতটি ছেলে পিলে আগলাইয়া বড় বড় সংসারের কাজ চালাইয়াছেন, আর এই বিবি

সাহেব তিনটি ছেলে প্রসব করিয়াই এত নবাব হইয়াছেন যে তাঁর সোয়ামী ভাত রাঁধিয়া দিবে তবে তিনি খাইবেন।" এক আধদিন যখন মাধুরী শরীর বেশী খারাপ বোধ করিত, তখন ভবেশ কিছুতেই তাহাকে রাঁধিতে দিত না, সে নিজে রাঁধিত।

বউদের মহলে আলোচনা একটু স্বতন্ত্র রকমের হইত। যদি চ কেহ কেহ মাধুরীর ঢং দেখিয়া নাক সিটকাইতেন এবং সকলেই ভবেশের পত্নী-সেবা লইয়া হাসি তামাসা করিতেন, তবু তাঁহারা সবাই মাধুরীর ভাগ্যের ব্যাখ্যানা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিশেষ ব্যাখ্যানা করিত মাধুরীর অন্তরঙ্গ সখী, তার পাশের বাড়ীর বউ মালতী। মালতীরও তিন চারিটি ছেলে পিলে; তার উপর তার শরীর অত্যন্ত খারাপ। পেট জোড়া প্লীহা আর জ্বর রোজ লাগিয়াই আছে। মাঝে মাঝে খুব বেশী জ্বর হইলে কয়েক ঘণ্টা বিছানায় শোয়, না হইলে সে জ্বর গায়েই রান্না বাড়ি প্রভৃতি সব গৃহ কার্য্য করে। মরিয়া মরিয়া সে করে—না করিলে কে করিবে? তার স্বামী স্পর্দ্ধা করিয়া বলে সে মদ্দা মানুষ। মেয়ে মানুষকে শাসনে রাখিতে জানে। সুতরাং সে সমস্ত গৃহস্থালী, মায় শিশুগুলি রুগ্না স্ত্রীর হাতে দিয়া সারাদিন পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়—কাজ বিশেষ কিছু করে না।

মালতী রোজ একবার ঘাটে যাইবার সময় মাধুরীকে দেখিয়া যায়। তাকে একলা পাওয়াই ভার,—ভবেশ তার পাশে লাগিয়াই আছে। তবু মালতী ছাড়ে না। যদি কোনও ফাঁক পায়, এই আশায় সে রোজ আসে এবং ফাঁক পাইলেই দু দণ্ড বসিয়া যায়। সে প্রায় রোজই বলে, "তোমাদের দুজনকে দেখলে ভাই চক্ষু জুড়ায়। ধন্য কপাল ক'রেছিলি বোন, তাই এমন স্বামী তোর!"

এ কথায় মাধুরীর বুক সাত হাত ফুলিয়া উঠিত। সে এক রকম নাচিতে নাচিতে আসিয়া স্বামীকে এই খবরটা দিত।

সুখেই তাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু ঠিক আগের মত সুখে নয়। মাধুরী দেখিতে পাইত যে ছেলেপিলেদের লইয়া তার স্বামী সর্ব্বদা বিব্রত। তাহার মুখের আগের সে পরিপূর্ণ প্রফুল্লতা নাই। ছেলে পিলেদের সে খুব বেশী ভালবাসে, তাই তার উদ্বেগের অন্ত নাই। এই শিশুদের লইয়া খাটিয়া খাটিয়া তাহার শরীর বেশ খারাপ হইয়া চলিয়াছে। তার উপর তার নিজের অসুখ; নানা দুশ্চিন্তায় ও পরিশ্রমে স্বামী মুখ ফুটিয়া কিছু বলুক না বলুক কষ্ট পাইতেছে তাহা সে স্পষ্টই দেখিতে পাইত। স্বামীর কষ্ট লাঘব করিবার জন্য সে মরিয়া মরিয়া খাটিত, তার যে কষ্ট হইত কোনও দিন মুখ ফুটিয়া বলিত না।

ভবেশ দেখিত মাধুরী তার চোখের সামনে মুষড়িয়া পড়িতেছে। কেন তার নিজের শরীর এত খারাপ তার গভীর কারণ সে অনুসন্ধান করিত না। চিকিৎসার ভার সে কবিরাজের হাতে দিয়া সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মাধুরীর শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এইটাই তার মহা দুঃখের কারণ ছিল। অসুখের উপর তাহাকে কাজ করিতে হয়, ইহাতে ভবেশ আরও দুঃখ পাইত। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত মাধুরীর কাজ করিয়া দিতে, কিন্তু সব তো সে পারে না।

ভবেশের অবস্থা স্বচ্ছল। এবং অবস্থা স্বচ্ছল, চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না বলিয়াই সে লেখা পড়া বিশেষ করিতে পারিল না। কিন্তু তার অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে তার স্ত্রীর এই অবস্থায় ঝি চাকর বামুন রাখিয়া চালাইতে পারে। তবু সে বামুন একটা কয়েকদিন রাখিয়াছিল; বাহিরের কাজ করিবার একটা ঝি বরাবরই তার ছিল। কিন্তু বামুনের হাতে দুই চারি দিন খাইয়াই মাধুরীর অসহ্য হইল, সে জোর করিয়া বামুন ছাড়াইয়া দিয়া নিজেই রাঁধিতে লাগিল। ভবেশ ছেলেপিলেদের রাখিবার জন্য একটা ঝি কয়েক দিন রাখিল, কিন্তু তাহারা নিজেরা ছেলেপেলেদের যেমন

আদর সোহাগ দিয়া দিন রাত যত্ন করে, ঝি তেমন করিতে পারিত না বলিয়া তাহাকে দুই তিন দিনের মধ্যেই বিদায় করিয়া দিল। ভবেশ সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ছেলে পিলে রাখে, আর রান্নাঘরের সব কাজই করে, তবু মাধুরীর শরীরের খাটুনি যে খুব বেশী হইতেছে, তাহা দেখিয়া ভবেশ মনে ভারী কষ্ট পাইত।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবেশ বহুকষ্টে নিজকে সংযত এবং মাধুরীকে সম্মত করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইল। কথা রহিল, যে, সে ছয় মাস বাপের বাড়ী থাকিবে। ভবেশ সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল তীর্থ পর্য্যটনে। মাধুরীকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া ভবেশ একদণ্ড সে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না, তাই সে পলাইবার পথ ঠিক করিল তীর্থ।

৪

বেশী দিন মাধুরীর বাপের বাড়ী থাকা চলিল না। ভবেশের তীর্থ-যাত্রাও গয়া হইতেই স্থগিত হইল। গয়ায় বাপদার পিণ্ড দিয়া ছট্ ফট্ করিয়া ভবেশ বাড়ী ফিরিল। মাধুরীও তাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়া অস্থির করিল, তার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়াছে, ছেলে মেয়েরা বাপের জন্ত বড় কান্নাকাটি করে ইত্যাদি।

একমাস পূর্ণ না হইতেই মাধুরী পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিল। তার জ্বর ছাড়িয়াছে, শরীরও একরকম সারিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। সে আসিয়াই পূর্ণোদ্যমে সংসারের কাজ আরম্ভ করিল।

ভবেশের মাথায় ক্রমে আর একটা দুশ্চিন্তা ঢুকিয়া গেল। দুটি মেয়ের যে বিবাহের জোগাড় করিতে হইবে, এবং যোগ্য ঘরে বরে মেয়ে দিতে যে অনেক টাকা লাগিবে, সে কথা তার মনে হইল। মনে হইতে তার বুকটা দমিয়া গেল। তার যে অবস্থা, তাতে গুছাইয়া চলিলে তারা স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া কাটাইতে পারে, এবং দুই তিনটি ছেলে মানুষ করিতে পারে, কিন্তু দুটী মেয়ের ভাল বিয়ে দেওয়া—সে তো ভীষণ ব্যাপার। অথচ টাকার অভাবে যে মেয়ের তার ভাল বিবাহ হইবে না এ কথা ভাবিতেও দুঃখ হইল। এখন তার মনে হইল যে, অবস্থা স্বচ্ছল বলিয়া লেখাপড়া না করাটা তার একটা মস্ত হিসাবের ভুল হইয়াছে। এই অবস্থার উপর সে যদি লেখাপড়া শিখিয়া একটা বড় চাকরী বাকরী করিতে পারিত, তবে তার দুঃখ থাকিত না।

এই সব ভাবনা চিন্তা আরও বাড়িয়া গেল, যখন চতুর্থ ও পঞ্চমবার

আঁতুড়ে গিয়া মাধুরী একাদিক্রমে আরও দুইটি কন্যা প্রসব করিল। ভবেশের মাথা ঘুরিয়া গেল।

কিন্তু তার মাথা একেবারে ঘুরিল, যখন তার পরের বার মাধুরী আঁতুড়ে গেল, আর ফিরিল না। একটি ছেলে প্রসব করিয়া তার জ্বর হইল—সেই জ্বরে মাধুরী মরিল. ছেলেটাও বেশী দিন বাঁচিল না।

ভবেশ শোকে একেবারে অবসন্ন হইয়া গেল। কিন্তু শোক করিবার তার অবসর কোথায়? পাঁচটি শিশু সন্তান তার ঘাড়ে, তাদের দেখিবার যে আর কেউ নাই। ভবেশ তাহাদিগকে বুকের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিল। সে কাঁদিল, কিন্তু ছেলেপিলেদের মানুষ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। একটা ঝি রাখিল। নিজে সে রাঁধে আর মায়ের মত কোলে কাঁকে করিয়া পাঁচটী শিশুকে পরম যত্নে মানুষ করে। অবসর কালে সে মাধুরীর ধ্যান করে, তার এতদিনকার সুখের ঘর, তার এই কয় বৎসরের আনন্দের স্মৃতি ধ্যান করিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যায়। এক এক সময় সে ভাবে বুঝিবা তার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে। জগৎসংসার সে একবারে অন্ধকার দেখে; কিন্তু মাধুরীর মুখের ছাপ লইয়া শিশু কয়টি তাহাকে ঘিরিয়া জিয়াইয়া রাখে।

মাধুরীকে যখন দাহ করিতে যায় তখন একজন তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। ভবেশ মনের দুঃখে তাহাকে মারিতে গিয়াছিল। সে ব্যক্তি বলিল, "শ্মশানে এ প্রস্তাব ক'রতে হয়, না হ'লে স্ত্রী স্বামীর উপর ভর করে।" এ কথায় তার আরও রাগ হইল, তার মাধুরীর স্মৃতির এত বড় অপমান সে সহ্য করিতে পারিল না।

কিন্তু দুই মাস না যাইতেই একদিন যোগেন রায় আসিয়া বলিলেন, "ভায়া হে, তুমি ত এই ছেলে পিলেগুলি নিয়ে ভারি গোলে পড়েছ দেখছি।"

ভবেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "কি করব দাদা, ভগবানের মার!" "এমন করে আর কয়দিন যাবে ভাই। মালক্ষ্মী ত এদের অনাথ ক'রে গেছেন, তুমি ভাই বেটা ছেলে, তুমি এদের কি ক'রে মানুষ ক'রবে বল।"

"কে আর ক'রবে বলুন?"

"এমন তো চলবে না ভাই, একটি বড় সড় মেয়ে দেখে বিয়ে থা' কর, যে এসেই তোমার সংসার বুঝে নিতে পারে।" একবার কাতরকণ্ঠে ভবেশ বলিল, "দাদা, কি ব'লছেন? সে যে দু'মাসও যায় নি।" তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

যোগেন্দ্র—"তা ত দেখছি। কিন্তু এমন করে দিন কাটালে তো তোমার চলবে না।" ক্রমে যোগেন্দ্র বলিলেন, "আমার ভাগ্নীর একটা বয়স্থা মেয়ে আছে; আমার জানা মেয়ে, দেখতেও লক্ষ্মী ভিতরও লক্ষ্মী, ঠিক বৌমারই মত। বল তো আমি সম্বন্ধ স্থির করে দেই। ছেলেপিলেদের নইলে দেখবে কে, আর তোমাকেই বা দেখবে কে? এমন করে' ক'দিনই বা বাঁচবে তুমি?"

"যদি নাই বাঁচি দাদা, তবে তখন আমার ছেলেপিলের দেখাশুনা ক'রবেন, আপনারা পাঁচজনে তাদের ভার নেবেন। এখন আমায় রেহাই দিন।"

বলিয়া ভবেশ সেখান হইতে পলায়ন করিল।

কিন্তু চারিদিক হইতে লোকে তাহাকে বেড়িয়া ধরিল। দেখা গেল গ্রামের প্রত্যেকেরই আত্মীয়ের মধ্যে এমন সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দরী বয়স্থা গুণবতী মেয়ে আছে যে ভবেশের ছেলে পিলে মানুষ করিবার জন্য কোনও ভাবনা হইবার কথা নয়।

যতীন মজুমদারের বিধবা ভগ্নী কাত্যায়নী আসিয়া উপযাচক হইয়া

ভবেশের ছেলেপিলেগুলির ভার লইলেন। তিনি তাহাদের খাওয়া পরা দেখাশুনা করেন, তাদের লইয়া নিজের বাড়ীতে খেলা দেন, সদা সর্ব্বদাই তাদের ও ভবেশের জন্য খাবারটা তরকারীটা পাঠান।

ইঁহার প্রতি ভবেশের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু যেদিন কাত্যায়নী দেবী হঠাৎ এক যুবতী দেওর ঝিকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে যাইবার পথে ভবেশের ছেলে পিলেদের লইতে আসিলেন, সে দিন ভবেশের একটু সন্দেহ হইল। প্রথমটা ঠিক সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু মেয়েটীর ব্রীড়া সঙ্কুচিত মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল বুঝি বা কাত্যায়নীর উদ্দেশ্য ভাল নয়। তার পর যখন সেই মেয়েটিকে রোজই নানা রকমে ভবেশের সামনে উপস্থিত করা হইল এবং ছেলেপিলেদের মুখে এই মেয়েটির আদর যত্নের কথা শুনিতে পাইল, তখন তাহার সন্দেহ ঘনীভূত হইল। শেষে একদিন কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সত্য সত্যই মেয়েটীর সঙ্গে ভবেশের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন।

মেয়েটি দেখিতে দিব্য। তার ভরা যৌবন তার শরীরের দুই কুল ছাপাইয়া উঠিয়া তার রূপের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আর ভবেশ যতদূর দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহাতে সে গুণবতী ও বুদ্ধিমতী। ছেলে মেয়েদের সে যে যত্ন করে তাহা দেখিয়া ভবেশ একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য—ভাবিল বিবাহ করিলে হয় তো মন্দ হয় না। কিন্তু এ কথা মনে উঠিতেই তার মনে এত বড় তীব্র একটা অনুশোচনা আসিল যে, সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। পরের দিন সকালে সে কেবল কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকে বারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, এসব উৎপাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় সে ছেলে পিলেদের লইয়া শ্বশুরবাড়ী পলায়ন করিল।

মাধুরীর মৃত্যুর ছয়মাস পর ছেলে পিলে লইয়া সে শ্বশুরবাড়ী গেল, তাহাকে দেখিয়া সকলে ভয়ানক কান্নাকাটি সুরু করিয়া দিল—ভবেশ

নিজেও অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। এই বাড়ীঘর সবই যেন মাধুরী আবার নূতন করিয়া ভবেশের মনের মধ্যে জাগাইয়া দিল।

শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সকলেই তার যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। তার ছেলে পিলের যত্নের অবধি রহিল না। ভবেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। সে ভাবিল যে সে কতক ছেলে মেয়ে এখানেই রাখিয়া কেবল বড় দুইটিকে লইয়া যাইবে। দিদিমার কাছে ইহারা যত্নে মানুষ হইতে পারিবে।

একমাস না যাইতেই তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তার শ্বশুর স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন যে ভবেশ তার শ্যালী সুরমাকে বিবাহ করিলে সবই বজায় থাকে—যে গেছে সে গিয়াছে, ইহাতে সম্পর্কটা বজায় থাকে ছেলেপিলেগুলি মানুষ হয় ইত্যাদি।

সুরমা যেন মাধুরীরই ছবি, বুঝি তার চেয়েও সুন্দর। তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এ কয় দিন ভবেশ যেন মাধুরীকেই চোখে চোখে দেখিয়াছে—তার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিবাহ? হায়! মাধুরীর বাপ মা কি বলিয়া এ কথা মুখে আনিতে পারিলেন! মাধুরী যে তার কি ছিল তা কি এঁরাও জানেন না।

ভবেশ চক্ষের জলে ভাসিয়া অস্বীকার করিল; তার শ্বশুরও অশ্রুমার্জ্জন করিলেন।

ভবেশের বড় ভয় হইল। এখানে বাস করা এখন তার অসম্ভব বোধ হইল। ইহার পর আর সুরমার দিকে সে চাহিতে পারিবে না। তা ছাড়া এখানে আর থাকিলে সে কি ফ্যাসাদে পড়িবে, তার ঠিকানা কি?

সে তল্পীতল্পা গুটাইল। শ্বাশুড়ীর কাছে ছেলে মেয়েদের রাখিয়া একদিন সে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া গেল।

ছয় মাস পর খবর আসিল সে লাহোরে গিয়া ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসা করিতেছে, শীঘ্র দেশে আসিবে না।

নটবর বলিল, সৃষ্টিছাড়া বলে সৃষ্টিছাড়া, বাবা, বেটাছেলে হয়ে বিয়ের ভয়ে দেশত্যাগী হয়? তবু তো স্ত্রী মরে গেছে! বিয়েটা ভয়াবহ কি বাপু?

৫

লাহোরে ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসা বেশী দিন চলিল না। এদিকে ছেলে মেয়েগুলির জন্য প্রাণটা ছটফটাইয়া উঠিল। তা ছাড়া, ভবেশ দেখিল যে, লাহোরে ব্যবসা করিতে গিয়া তার দেশের ভূসম্পত্তি যায় যায়। ইত্যাদি নানা কারণ সম্বাতে বাধ্য হইয়া ভবেশ রায় এক বৎসর পরে হাজার খানেক টাকা লোকশান দিয়া দেশে ফিরিয়া ছেলে মেয়েদের লইয়া ঘর করিতে লাগিল।

তার কলঙ্কের কথা বড় রটনা হইয়া গিয়াছিল। বাঁশবন গ্রামে যে আসিত, কেউ একবার এই অদ্ভুত জীবকে না দেখিয়া যাইত না,—যে স্ত্রী মরিবার পর বিবাহ তো করিলই না, বিবাহের ভয়ে দেশ ছাড়া হইয়া পলাইয়াছিল! অনেকে দূর গ্রাম হইতে লোকে কেবল তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

নটবর বলিল, "আমাদের ভবেশ যেন এক চিড়িয়াখানার বাঁদর বনে' গেছে। যে এখানে আসে সেই তার কাছে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এত বাঘ সিংহ মোষ ভেড়া এ গাঁয় থাকতে বাঁদরটাই সবাইকে একচেটে করে নিয়েছে। ভবেশ লোকের এ কৌতূহল সম্বন্ধে প্রগাঢ় অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য দেখাইয়া পরম আগ্রহের সহিত বেড়া বাঁধা হইতে ভাত রাঁধা পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহকার্য্য করিতে লাগিল। তার সংসার প্রায় আগে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, তফাতের মধ্যে আগে যেখানে ছিল মাধুরী সেখানে আসিল এক শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা পিসি—তাও অতি দূর সম্পর্কের! মাধুরী যে পরিমাণে সুন্দর ছিল ভবেশের পিসি সেই পরিমাণে কুৎসিত। মাধুরীর কথায় যে পরিমাণে মধু ছিল, এঁর কথায় সেই

পরিমাণে বিষ। ইনি ছেলে পিলে মানুষ করেন, যেমন মাধুরী করিত,—কিন্তু মাধুরী যেখানে দিত মিষ্টান্ন ইনি সেখানে দেন চড় ও কিল, মাধুরী যেখানে দিত চুমা, ইনি সেখানে দেন দাঁত খিঁচুনী। এই সামান্য প্রভেদের জ্বালায় ভবেশ ছট্‌ফটাইয়া উঠিল।

এতটা সে হাঁপাইয়া উঠিল যে, কয়েক বছর পর যখন তার স্কুলের সহপাঠী গোকুল মুন্সী তার সঙ্গে তর্ক করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহের পক্ষে যুক্তি দিতে লাগিল, তখন সে যে প্রতিবাদ করিল সেটা খুব তীব্র হইল না। বরং তার মনে হইল যে তার নিজের ঘরের অভিজ্ঞতায় সে গোকুলের সপক্ষে আরও গোটা দুই চার যুক্তি জোগাইতে পারে।

গোকুল ভবেশের চেয়ে কমবয়সী হইলেও এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সে ক্রমান্বয়ে তিনটী স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি সমাধা করিয়া চতুর্থ পক্ষের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। স্ত্রী-খাদক বলিয়া তার একটা অপবাদ রটনা হওয়ায় এই বারে সে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবু সে হাল ছাড়ে নাই। তার প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা হইতে সে নিশ্চয় করিয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে, বিশেষতঃ গরীবের ঘরে যে রকম উর্ব্বতার সহিত মেয়ে জন্মায় এবং মেয়ের বিবাহ ব্যাপারটা যে রকম সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে একদিন না একদিন কোনও না কোনও মেয়ের—বাপ না হউক, পিতৃহীন কন্যার ভারাগ্রস্ত মামা মেসো বা পিসে' আসিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিবেই।

গোকুলের প্রথম যুক্তি এই যে, অল্পবয়সে স্ত্রী-বিযুক্ত পুরুষ দারান্তর পরিগ্রহ না করিলে ভ্রষ্ট-চরিত্র হইয়া পড়ে।

ভবেশ বলিল, "দোহাই ভাই, এতকাল এ অপবাদটা কেউ আমায় দেয় নাই। তুমি একটা 'রুল অভ থ্রি' করে আমার বদনাম কর্‌'তে চাও?"

"আরে রসো দাদা, রসো। এক মাঘে শীত যায় না। স্ত্রী জিনিসটা অভ্যাস হ'য়ে গেলে, এ না হ'য়ে যায় না। আজ হ'ক, দু'দিন বাদে হ'ক, হ'তেই হ'বে। এখনো তোমার চল্লিশ পেরোয় নি, স্বভাব খারাপ হ'বার তো তোমার ব'লতে গেলে বয়সই হয় নি।

তার পর সে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত মুখে মুখে দিয়া গেল, যাহারা প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভ্রষ্ট চরিত্র হইয়া যায়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, সেই সব ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল সত্য, এবং তাহাদের চরিত্রও মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই দ্বিতীয় দার গ্রহণ করা সত্ত্বেও হইয়াছিল।

গোকুলের দ্বিতীয় যুক্তি, বিবাহ না করিলে সংসার ছারখারে যায়, সুখ শান্তির মুখ দেখা চুকিয়া যায় ; দৃষ্টান্ত—

ভবেশ বাধা দিয়া বলিল, "দৃষ্টান্তের আর দরকার নেই, মেনে নিচ্ছি।—ঘর পুড়ে গেলে যে ছাই হয়, এর আর দৃষ্টান্তের দরকার কি ? সে ছাই দ্বিতীয় পক্ষে আবার গড়ে ওঠে কি ? আমার তো জানা শোনার মধ্যে যতদূর দেখি, তাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে সংসারটা আরও ছারখারে গেছে।"

একেবারে আপ্ত বাক্যের গোছ করিয়া জোর করিয়া গোকুল বলিল, "তা নয়। আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমার তিনটি স্ত্রী ক্রমান্বয়ে সংসার বেশ গোটা রেখেছিলেন, এত দিনে সে সংসার ভেঙ্গে পড়েছে।"

"না হয় তাই হ'ল। বরাতে যদি না থাকে, তবে জোড়া-তাড়া দিয়ে কি সুখ খাড়া করা যায় ? তোমার তো দুবার তালি দিয়েও সে শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না।"

"শেষ এখনো হয় নি। এখনি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?"

ভবেশের একটা কথা মনে হইতে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর সুখই ভাই থাকে কই। দিন যতই যায়, সংসারের বোঝা বাড়তে থাকে, আর সুখ পায় পায় বিদায় হ'তে থাকে। আমার স্ত্রীর শেষ কালে তাঁর কি আমার কারোই যে খুব বেশী সুখ হয়েছিল, তা তো মনে হয় না। পাঁচটি আমার ছেলে পিলে, তার মধ্যে চারটি মেয়ে!—আবার আমার বিয়ে ক'রলে তো সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে, ছেলে মানুষ ক'রতে হবে!

"আর একটা দিক ভাবছো না তো। চারিটি মেয়ে বিয়ে দিলেই বেরিয়ে গেল। ছেলেটি আজকালকার, মানুষ যদি ক'রলে তাকে, তো সে মাগ্ নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার পর বুড়া বয়সে তোমায় দেখবে কে? তখন কি পাকা চুলে টোপর পরে ছাঁদনাতলায় যাওয়া ভাল দেখাবে? না, এখন সময় থাকতে তার ব্যবস্থা করবে? বিয়েটা হচ্ছে happiness insurance for old age."

গোকুলের তৃতীয় যুক্তি বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক। "এই যে মেয়ের বিয়ের সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠছে, এর কারণ কি? ছেলে কম, মেয়ে বেশী। গরীবের মেয়ে তো পার করাই কঠিন। তার মধ্যে যদি তোমার মত ছোকরা দোজবরেরা 'বিয়ে নাই করেঙ্গা' ব'লে বেঁকে বসে, তবে গরীব মেয়ের বাপ দাঁড়ায় কোথায়, বল দেখি? এই ধর না আমার তৃতীয় পক্ষের মামাশ্বশুর! ভাগ্নীটি তার ঘাড়ে পড়েছিল। পার ক'রতে পারে না; আঠার বচ্ছর বয়স হ'ল; আমি যাই বিয়ে করলাম, বেচারা যেন হাতে স্বর্গ পেল।"

ভবেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মামা নয় হাতে স্বর্গ পেলে। কিন্তু ভাগ্নীটি পেলেন কি?"

"গয়না, কাপড়, টাকাকড়ি আমার কাছে যা পেল, তা বাপের জন্মে চ'খে দেখেনি। খুসী হ'য়ে দিন রাত খাটতো। হেঁসেল থেকে বের হ'ত

না। এমন স্ত্রী হয় না। শেষে আঁচলে একদিন আগুন ধরে মারা গেল। নয় তো আমায় পায় কে? পায়ের উপর পা দিয়ে থাক্‌তাম ভাই—রাজার হালে, আর বাঁদীর মত তাকে হুকুম ক'রতাম। নেহাৎ গরীবের বাপ-মা-মরা মেয়ে কি না! ওদের হুকুম করে' জুত আছে।"

এই কথা গুলি যেন ভবেশের সারা অঙ্গে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়া গেল। ছয় মাস হয় নাই যে গোকুলের স্ত্রী মরিয়াছে, ইহার মধ্যে সে এমন নির্ম্মম ভাবে তার কথা বলিতে পারে! এ কি মানুষ, না কি? আজ সাত বছর মাধুরী গিয়াছে, কিন্তু আজও যে তার কথা মনে হইতেই ভবেশের হৃদয় অপূর্ব্ব রসে ভরিয়া উঠে—সে স্মৃতিগুলির পুঞ্জীকৃত ব্যথার সুখ অনুভব করে। আর এ কি?

ভবেশ বলিল, "দেখ ভাই, তর্ক বৃথা। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার ও আমার আদর্শ এত স্বতন্ত্র যে, তোমার সঙ্গে আমার কোনও কথাই চলে না। তুমি যাকে বিয়ে বল, সে লোকে দশটা ক'রতে পারে। আমি যাকে বিয়ে মনে করি, তা লোকে একবার মাত্র ক'রতে পারে।"

গোকুল অট্টহাস্যে বলিল, "নিছক কাব্য! হাঁ ভাই, তুই চিরদিনই ছেলেমানুষ র'য়ে গেলি, বুদ্ধিসুদ্ধি তোর পেকে উঠলো না এখনো। আরে, এমনি আমিও ভেবেছিলাম এক দিন—মাস দু'য়েকের জন্যে—যখন প্রথম স্ত্রী মারা গেল। তার পর বুঝতে পারলাম, কাব্যে পেট ভরে না। হাঁড়ি ঠেলবারও লোক চাই; সংসার দেখবারও লোক চাই। জ্যোছনার অনুপান দিয়ে চুমো খেলে যদি ভাত খাবার দরকার না হ'ত, তবে এসব কাব্যি চলতো। ভায়া হে, বয়স হ'য়েছে, এখন ওসব কাব্য ঝেড়ে ফেল, নইলে মারা যাবে।"

৬

গোকুল চলিয়া গেল। ভবেশ তার উপর ভারি বিরক্ত হইয়া রহিল। এদিকে পিশির উপদ্রবে সংসারটা অরণ্য হইয়া উঠিল। এক একবার রাগের মাথায় তার মনে হইত যে, পিশিকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহা হইলে চলে কই। বড় মেয়ে সুধার এখন তের বছর, তার পরেরটির বার। বাড়ীতে একটা মেয়ে ছেলে না থাকিলে যে ভবেশকে একেবারে বন্দী হইতে হয়। অথচ আর কেউ এমন দুনিয়ায় নাই যে আসিয়া পিশির স্থান লইতে পারে। কাজেই পিশির উপদ্রব হজম করিতে হইল—কিন্তু সে বদহজমের মত।

সংসারের এই উৎপীড়নে যখন ভবেশ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিত, তখন ওই পাপিষ্ঠ গোকুলের কথাগুলিই তার মনের ভিতর ঘুরপাক খাইয়া ভাসিয়া উঠিত। এক একবার পিশি-সমস্যা সমাধান করিবার চিন্তায় সে হঠাৎ ভাবিয়া বসিত যে, 'দূর কর ছাই, একটা বিবাহই করিয়া ফেলি। তবু পিশির হাত হইতে তো উদ্ধার হইতে পারিব।' কিন্তু তখনই তার সুবুদ্ধি তাহাকে শাসাইয়া দুরস্ত করিত। সে স্মরণ করিত যে, পিশি বুড়ী, খুব বেশী দিন বাঁচিবে না, কিন্তু যাহাকে সে বিবাহ করিবে, সে হইবে চিরস্থায়ী।—সে যদি পিশির একটা রাজসংস্করণ হয়!—ধর যেমন দত্ত-গিন্নী! বাপ, অমন কাজও লোকে করে! তা ছাড়া, সে আরও ভাবিত যে, এখন তার জীবনের একটা ছক কাটা হইয়া গিয়াছে। ঠিক এই কয়টি ছেলে পিলে তার মানুষ করিতে হইবে, বিবাহ দিতে হইবে, তবেই লেঠা চুকিল। কিন্তু আবার বিবাহ করিলে, আবার সে অনিশ্চিতের সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। ছেলে পিলে বিষয়ে তার দায়িত্বের পরিমাণ যে

কতটা বাড়িয়া যাইবে, তার ঠিকানা নাই। আর যে পরিমাণে ছেলে পিলে বাড়িবে, সেই পরিমাণে সুধা শোভা প্রভৃতিকে তার দিবার ক্ষমতা কমিয়া আসিবে।

কাজেই গোকুলের যুক্তি মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া মাথায় আসিলেও, ভবেশকে বিশেষ কাবু করিতে পারিল না। সে এ সব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া, কোমর বাঁধিয়া সুধার জন্য বর খুঁজিতে লাগিয়া গেল। সুধার বয়স তের বছর—এখন বর খুঁজিতে হয় বই কি?

বর জোটানো সহজ হইল না। যেমন তেমন পাত্র দুই একটা জুটিল, কিন্তু সুধাকে তো যার তার হাতে দেওয়া যায় না। ভবেশের মন উঠিল না। কিন্তু ভবেশ ও মাধুরী দুজনেই সুন্দর হইলেও, সুধার রঙটা, কি জানি কেন, হইয়াছিল একটু ময়লা। তার মুখ চোখ দিব্য সুন্দর, রঙও বেশী ময়লা নয়; তবে ফর্সাও খুব নয়। ভবেশ টাকাকড়ি কিছু দিতে রাজী, কিন্তু কুবেরের ভাণ্ডার যৌতুক দিবার সঙ্গতি তো তার নাই! কাজেই ভবেশের মনের মত বর পাইতে বিলম্ব হইল।

এক দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। সুধা ও শোভা সমানে বড় হইয়া উঠিল; ভবেশের মাথা ঘামিয়া গেল। আগে যাহাদের সে নামঞ্জুর করিয়াছে, তাহাদের ও দুই একটা জায়গায় চেষ্টা করিয়া সে বিফলমনোরথ হইয়া, একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিল।

এমন সময় 'সুবর্ণ-সুযোগ' ঘটিয়া গেল। রাজগঞ্জের গুরুদাস বাবুর মেয়ে দুটি দেখিয়া ভারি পছন্দ হইল। তাঁর একটি ছেলে ও একটি ভাইপো আছে, দু জনেই কলিকাতায় এম-এ পড়ে। ঘরে বিশেষ কিছু নাই, তবে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলিতে পারে।

গুরুদাস বাবু মেয়ে দুটির শতমুখে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এই খানেই কার্য্য করবো।" টাকা পয়সা—রাম বল, এক পয়সাও তিনি

লইবেন না। যৌতুকের কোনও প্রয়োজন নাই, গহনা যে ভদ্রলোকের ঘরে না হইলে নয়, তেমনি তিন চার পদ দিলেই চলিবে—তিনি তো আর ছেলে বেচিতে বসেন নাই।

"তবে কি না জানেন? আমার একটি বৈমাত্র ভগ্নী আছে, বাবার বুড়ো বয়সের অপকীর্ত্তি। এখন বোঝা বইতে হ'চ্ছে আমার। তার একটা উপায় ক'রতে পারছি না। আপনি তো এখন আমার কুটুম্বই ধরুন, আপনার কাছে আর লুকোচুরি কি? সে এই উনিশ গিয়ে বিশে পা দিয়েছে; দেখতে শুনতেও বেশ, লেখা পড়া দিব্যি জানে, তা ছাড়া গান গায়—সব আজকালকার মত। তবু তার কোনও একটা উপায় ক'রতে পারছি না। কেবল টাকার জন্য। বুঝতেই তো পারছেন, আজকালকার বাজার! তিন হাজার টাকার কমে মেয়ে পার হয় না। তা আমি তিন হাজার টাকা পাই কোথা বলুন।"

ভবেশ প্রমাদ গণিল। এক সঙ্গে নগদ তিন হাজার টাকা বাহির করিতে হইবে বুঝিল। তার মেয়েকে সে বঞ্চিত করিতে পারে না, তাদের শ্বশুর চান বা না চান, সে তাদের গা ভরিয়া গহনা দিবেই। তার উপর নগদ তিন হাজার! তার চক্ষু কপালে উঠিল। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "এই বিষয়ে আপনার আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আমি আপনার কন্যাদায় থেকে আপনাকে উদ্ধার করলাম, আপনার আমাকে উদ্ধার ক'রতে হবে। এইটুকু আমি চাই।"

আমতা আমতা করিয়া ভবেশ বলিল, "তা' আপনি—এই তিন হাজার টাকা"—

"আ হা হা—ভুল বুঝবেন না! টাকা আমি আপনার ঠেঁয়ে এক পয়সাও নেব না। আপনি আমার দায় উদ্ধার করুন, আমার বোনটিকে নিন, আমি আপনার মেয়ে দুটি নিচ্ছি, এই।"

ভবেশ স্তম্ভিত হইল। তার মুখে কথা বাহির হইল না।

গুরুদাস বাবু পঞ্চমুখে ভগ্নীর সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়া দিলেন, ভবেশ ক্রমশঃই ঘামিতে লাগিল।

এ যে বড় ভীষণ সমস্যা! এত দিন পরে যদি বা মনের মত পাত্র জুটিল, কিন্তু তার এ কি মূল্য! অনেক দিন ভবেশকে কেহ বিবাহের কথা বলে নাই, আজ সে এ প্রস্তাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এক বাক্যে "না" বলিতে পারিল না। মেয়ের কথা ভাবিয়া থামিয়া গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, ভেবে দেখবো।"

গুরুদাস বাবু তাহাকে মেয়ে দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। সেই সঙ্গে ভবেশ ছেলে দুটিও দেখিয়া আসিবে।

সাত দিন ধরিয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া ভাবিয়া ভবেশ শেষে ছেলে দেখিতে গেল। ছেলে দুটি দেখিয়া ভবেশের ভারি পছন্দ হইল। সে মেয়েদের ইহাদের হাতে দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গুরুদাস বাবু তাহাকে মেয়েটিও দেখাইয়া দিলেন। তাঁর মেয়ে দেখাইবার প্রক্রিয়াটি একটু বিশিষ্ট রকমের। ভবেশকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া গুরুদাস একটা ঘরে লইয়া বসাইলেন এবং "এই আসছি" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর দরজার আড়ালে বামা কণ্ঠে চাপা তর্জ্জন গর্জ্জন ও মিনতির ও একটু ধস্তাধস্তির শব্দ পাওয়া গেল। তার পর দুই তিনটি স্ত্রীলোক একটি যুবতীকে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া ধপাস করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ভবেশ অবাক হইয়া গেল—

মেয়েটি মাটির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

এই কাণ্ডে ভবেশ চমকাইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! এ যে ফাঁদ! সে বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইল, কিন্তু ঘরের অন্য দরজা ছিল না।

সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আর মেয়েটি সামনে লজ্জিত পীড়িত মুখে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ ছবি যে ভবেশের বুকে একটু ঘা না দিল, এ কথা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি অগ্রসর হইয়া তার সামনে পাণের বাটা ধরিল—বহু কষ্টে সে বলিল, "পাণ খান।" সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গুরুদাস বাবু ঘরে ঢুকিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বেয়ানের তামাসা, পটলি, প্রণাম কর।"

পটলি নিতান্ত বাধ্যভাবে প্রণাম করিল। তার পর গুরুদাস বাবুই তাহাকে তার বিদ্যা বুদ্ধি সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন করিলেন; সে যেন বাধ্য হইয়া উত্তর দিয়া গেল।

"এ কিরে! পাণের বাটা হাতে ক'রেই র'য়েছিস? আপনার পাণ খাওয়া হয় নি? দে দে পাণ দে।" পটলি বাটা খুলিয়া পাণ দিল, ভবেশ খাইল।

অনেকক্ষণ পর পটলি ছুটি পাইল। সে চলিয়া গেলে ভবেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মেয়েটি নেহাৎ মন্দ নয়। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভবেশের অনেকটা সহানুভূতি হইল। এ ব্যবহারে তার গুরুদাস বাবু বা তাঁর পরিবারের প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইল না। কিন্তু ছেলে দুটি বড় ভাল।

ভবেশ অনেক টানা-হিঁচড়া করিতে লাগিল, কোনও মতে নিজে বিবাহ না করিয়া মেয়ে দুটি পার করা যায় কি না। শেষ পর্য্যন্ত সে পটলির বিবাহের জন্য তিন হাজার টাকা দিতে স্বীকার হইল। কিন্তু গুরুদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে হ'বে না ভাই, সে আর হ'বার জো নেই। তোমাকে দেখে আমার বোন্‌টির যা মনে ধমে গেছে, তাতে আর সে হ'তে

পারে না। সেই থেকে সে তোমার নামে কত পদ্য লিখে ফেলেছে।"
বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অবশেষে ভবেশ শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া স্বীকৃত হইল। রীতিমত লগ্নপত্র
করিয়া তবে গুরুদাস বাবু ছাড়িলেন

৭

অনেক বকাবকির পর স্থির হইল যে, সুধা ও শোভার বিবাহই আগে হইবে, কিন্তু তার পর দিনই পটলির সঙ্গে ভবেশের বিবাহ সেই গ্রামেই হইবে।

উভয় বিবাহেরই আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। গোধুলি লগ্নে সুধার বিবাহ-হইল, শেষ রাত্রে শোভাকে সম্প্রদান করিয়া আসিয়া ভবেশ কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল।

মেয়েকে পরের হাতে তুলিয়া কোন বাপের না প্রাণ কাঁদে—ভবেশ তো তাদের একাধারে মা বাপ হইয়া এত দিন মানুষ করিয়াছে—স্নেহ দিয়া তাহাদের ভরিয়া দিয়াছে! সে কাঁদিবে না তো কে কাঁদিবে?

কিন্তু শুধু তাই নয়, ভবেশ আজ মাধুরীর কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিল। এমন দিনে তো তার কথা মনে হইবারই কথা। কিন্তু বিশেষ করিয়া মনে করিয়া দিল শোভা। সুধা ছিল অনেকটা বাপের মত, কিন্তু শোভার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ছিল মাধুরীর ছবি! আজ তাকে ভবেশ নিজ হাতে সাজাইতে সাজাইতে মাধবীকেই চক্ষে চক্ষে দেখিয়াছে আর চক্ষু মুছিয়াছে। শুভ-দৃষ্টির সময়ে সে তার লজ্জিত নত দৃষ্টি দেখিল! আর মনে পড়িয়া গেল এমনি মূর্ত্তি মাধুরীর। তার মনের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। কোনও মতে সম্প্রদান শেষ করিয়া গিয়া সে নির্জ্জনে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে ভবেশ তার শ্বশুরকে বাসি বিবাহের বন্দোবস্তের ভার দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। ভয়ানক দরকার বলিয়া বাইসিকেলে চড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। তিন চার ঘণ্টার পর ফিরিয়া আসিল। তার পর দুই জামাই লইয়া বসিয়া পংক্তিভোজন করিল। অশ্রু জলে ভাসিয়া জামাইদের হাতে মেয়ের হাত দিয়া বলিল, "আমার বড় আদরের, বড় দুঃখের ধন বাবা, যত্ন করো।" বৈবাহিককে ডাকিয়া তাঁর হাতে দুই মেয়ের হাত দিল।

হঠাৎ গোকুল মুন্সী আসিয়া হাজির হইল, ভবেশ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

যতীন মজুমদারের বাড়ী গ্রামের অপর কোণে। সেখানে অত্যন্ত শান্তভাবে সন্ধ্যা বেলায় একটা ছোট খাট বিবাহের আয়োজন হইতেছিল। বিবাহের কন্যা পটলি। গুরুদাস বাবু দুই ছেলে ও বউ লইয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া গিয়াছিলেন, পটলিকে সম্প্রদানের ভার দিয়া গিয়াছিলেন তাঁর এক জোঠতুত ভাই যোগেশের উপর। সে ও পটলির ছোট ভাই সুরেশ এক রকম একা পটলীকে লইয়া পড়িয়া ছিল। মজুমদার মহাশয় নিজেই বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন।

লগ্ন বহিয়া যায়, বর আসে না দেখিয়া যোগেশ ভবেশের বাড়ী গেল। ভবেশকে দেখিতে পাইল না! মেয়েদের পাল্কীতে উঠাইয়া সে কোথায় গিয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। যোগেশ পাগলের মত এ বাড়ী সে বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কোথাও সে ভবেশকে পাইল না।

মজুমদার বাড়ী আসিয়া দেখিল, গোকুল মুন্সী সেখানে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সে বলিল, "ভবেশকে পাবে না, পাবার উপায় নেই। সে বাইসিকেলে চড়ে পালিয়েছে, পরশু নাগাদ সে হয়তো কাশী কি গয়া পৌছুবে। সে আমাকে খবর দিয়ে আনিয়ে এই বন্দোবস্ত ক'রেছে।

যদি জাত রাখার দরকার হয়, তবে আমার হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রতে পার।"

যোগেশের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত বড় দায়িত্ব সে লইতে পারিল না! সে যতীন মজুমদারের সাহায্যে একটা ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া ছুটিল দাদার সন্ধানে—প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া সে চলিল।

পাড়ার লোক যতীন মজুমদারের বাড়ীতে জড় হইল। নটবর বলিল, "চিরদিন একভাব রইলো ছোঁড়াটার! যেন একটা বুনো শুয়োর, প্রাণ যায় তবু গোঁ ছাড়ে না। সাধে বলি সৃষ্টিছাড়া!" সবাই ভাবিতে লাগিল, কি হয়! গোকুল মুন্সী বিবাহের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু তার কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল, যেমন কেউ কখনও দেখে নাই, শোনে নাই! বাড়ীর ভিতর সাজিয়া গুজিয়া পিঁড়ির উপরে পটলি বসিয়া ছিল। তার কাছে সবাই গিয়া লতাপল্লবিত করিয়া সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া সে চক্ষু দুটি বড় বড় করিয়া চাহিল।

পটলি বলিল, "যোগেশ দাদাকে ডাকুন একটু।"

একজন বলিল, যোগেশ নাই সে গুরুদাসের সন্ধানে গিয়াছে।

পটলী হঠাৎ বলিল, "তাঁর কাছে কেন? তাঁর কাছে যাবার তো কোনও দরকার ছিল না। তাকে ফেরান যদি পারেন। বলুন, আজ রাত্রে আমার বিয়ে হওয়াই চাই, যে আমাকে বিয়ে ক'রবে তাকেই আমি মালা দেব।"

সবাই অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল। কেউ হাসিল, কেউ আকাশের দিকে চাহিল, কেউ ছুটিল এই পরম কৌতুকের কথাটা দশজনের কাছে বলিতে। কিন্তু পটলীর কথা অনুসারে কাজ করিতে কেহই গেল না। এমন সময় যতীন মজুমদার আসিলেন। পটলী তাঁহাকে বলিল, "আমার ভাই সুরেশ আছে?"

সুরেশ পটলীর ছোট, বয়স বছর আঠার। সে হতভম্ভ হইয়া বাহিরে বসিয়া ছিল।

সুরেশকে ডাকাইয়া পটলী তাহার হাত ধরিয়া সটান বাহিরে গেল। গোকুলের কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি আমার জাত রক্ষা করুন, এই ভাই আমায় সম্প্রদান ক'রবে।"

সবাই হতভম্ভ হইয়া গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল।

এই কাণ্ডটার তলায় একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস ছিল।

পটলী গুরুদাসের বৈমাত্র ভগ্নী। তাহাতে আবার সে মাতৃহীনা। সে ও সুরেশ গুরুদাসের সংসারে ভূতের খাঁটুনি খাটিয়া কোনও মতে অযত্নে মানুষ হইয়াছিল। আজ পাঁচ ছয় বছর হইল, তার বিবাহ হয় না বলিয়া খোঁটা খাইতে খাইতে তার অন্তর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বউদিদিদের এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীদের কাছে গঞ্জনা ও নিষ্ঠুর উপহাস সহিয়া সহিয়া সে মর মর হইয়াছিল। সেই গঞ্জনা ও অপমানের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, যখন তাহারা তাহাকে ঠেলিয়া ভবেশের ঘরে দিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিবার পর সে স্থির করিল, আর এ যাতনা সয় না। ভবেশকে ভুলাইয়াও যদি বিবাহ করিতে হয়, তাও সে করিবে। তাই সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল ভবেশের কাছে,—ঠিক সেই সময় গুরুদাস আসিয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিলেন।

তার পর তার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। সে যখন বিবাহ করিবার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া আসিল, তখন গঙ্গাজল হাতে করিয়া গোপনে শপথ করিয়া আসিয়াছিল যে, আর সে গুরুদাসের বাড়ী ফিরিবে না।

যখন ভবেশ নিরুদ্দেশ হইল এবং গোকুল মুন্সী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন তার আশঙ্কা হইল যে, পাছে এই গোলযোগে

বিবাহ ফাঁসিয়া গিয়া, তার সেই বাড়ীতে আবার ফিরিতে হয়। তাই সে এমন ভয়ানক সাহসের কাজ করিয়া বসিল।

ভোর বেলায় যোগেশ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া ফিরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "দাদা পটলিকে ফিরিয়ে নিতে ব'লেছেন, 'বল্লেন, 'ভবেশ রায়ের আর মেয়ের মুখ দেখতে চ'চ্ছে' না।"

তখন বাসরে বসিয়া পটলিকে বামে বসাইয়া গোকুল মুন্সী নানারকম মামুলি খেলা খেলিতেছে।

নটবর

১

নটবর দাস বাঁশবন গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তার ধন-সম্পত্তি এক রকম কিছুই নাই। জাতিতে সে কায়স্থ, সুতরাং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আধিপত্যও তার নাই। এক রকম কোনও কিছুই নাই—তার প্রতিষ্ঠা কেবল জিহ্বার জোরে। সে খুব বেশী বলিত না, কিন্তু যা বলিত, তা সত্য আর ভয়ানক সরল। লোকে সে কথায় না হাসিয়া পারিত না—কেবল সেই ছাড়া, যার আঁতের ভিতর গিয়া কথাটা ছুরির মত বসিয়া পড়িত।

বলা বাহুল্য, নটবরের লেখাপড়া বেশী কিছু হয় নাই। নতুবা সে গ্রামে বসিয়া থাকিত না। একটা ডেপুটী, কি মুন্সেফ, কি উকীল, কি ডাক্তার, কি মাষ্টার, কি নিদান একটা উকীলের মুহুরী হইয়া গ্রামের পাপ সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিত। লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই, গ্রামে একখানা ভদ্রাসন ও যৎকিঞ্চিৎ জোতজমা ছিল; তাই সে গ্রামেই পড়িয়া রহিল। তার ভদ্রাসন—তা' সেটা যে খুব ভদ্র ছিল, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বিঘা দুই জমী তার ভদ্রাসন, তার বেশীর ভাগই আম কাঁটালের বাগান বা জঙ্গল; তার মধ্যে মরুভূমে ওয়েসিসের মত দুইখানি খড়ের ঘর—একটা শুইবার, আর একটা রাঁধিবার। ইহার মধ্যে বাস করে দুটি প্রাণী—নটবর এবং তার গৃহলক্ষ্মী অম্বিকা।

অম্বিকা ঠাকুরাণীকে নটবর সময় অসময়ে সর্ব্বদাই গৃহলক্ষ্মী বলিত,—

সেটা ঠাট্টা করিয়া কি না, বোঝা কঠিন। কেন না, অম্বিকার চেহারার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীর অংশও ছিল না। কালো রং, দোহারা গড়ন—বেঁটে বলিয়া তার দোহারা চেহারা একটু বর্ত্তুলাকারের মতই দেখাইত। মুখের কোনও অংশেই সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতও হয় নাই। তদুপরি তার বেশ একজোড়া চলনসই রকম গোঁফের রেখা ছিল।

এই তো গেল চেহারার লক্ষ্মীশ্রী। গৃহিণী হিসাবেও তাঁর লক্ষ্মীত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তিনি নটবরের ঘরে কেমন করিয়া আসিলেন, সে তথ্য সুদূর অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাঁশবন গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভাবে তার উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এইটুকু লোকমুখে চলিয়া আসিয়াছে যে, তখন নটবরের বয়স ছিল সাত বৎসর, আর অম্বিকার পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর। কিন্তু অম্বিকা আসিয়া নটবরের ঘর যে ধনধান্যে ভরিয়া দেন নাই, সে নিশ্চয়। নটবর চিরদিনই অভাবের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছে। আর যা-ও কিছু নটবর উপার্জ্জন করে, তাও শ্রীমতী অম্বিকা গুছাইয়া খরচ করিতে পারেন না। সংসারে—গৃহস্থালীতে অম্বিকার শৃঙ্খলা, বা হিসাব-কিতাব, বা কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করিয়া কিছু করিবার অভ্যাস ছিল না। সে যখন যে কাজটা হাতের গোড়ায় পাইত, করিত ; যখন যেটা পাইত, খাইত ; যখন যা খুসী করিত। তাই তার ঘর-দুয়ার আবর্জ্জনায় ভরা, তার কাপড়-চোপড় সর্ব্বদাই ময়লা ও ছেঁড়া, তার রান্নাঘরের সঙ্গে পায়খানার বড় বেশী তারতম্য নাই। তাই নটবরের সংসারে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিলেও কোনও দিনই পা বসাইতে পারেন নাই।

চঞ্চলা লক্ষ্মী এদিক ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক আধবার এক আধটুকু উঁকি ঝুঁকি মারিতেন নটবরের আঙ্গিনায়। এক একবার তিনি একটু বেশী হাতেই কিছু নটবরকে পাওয়াইয়া দিতেন। তার পর হইতে নটবর ও

অম্বিকার হাত ছুল্‌বুল করিত,—তাহা অস্থির হইয়া যাইত সেই টাকাটা যেন তেন প্রকারেণ খরচ করিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে গলহস্ত দিয়া বিদায় করিতে।

একবার নটবর থোকে ৫০০৲ টাকা পাইয়া গেল একটা সাক্ষ্য দিয়া। গরীব হইলেও নটবরের সর্ব্বত্র আদর ছিল—বিশেষতঃ বড়লোকের বৈঠকখানায়। সে বেশীর ভাগ সময় এ তল্লাটের সব বড়লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াই কাটাইত। ছিদামপুরের জমীদারদের একটা প্রকাণ্ড মামলা বাধিল নফেশগঞ্জের সাহাদের সঙ্গে,—সে মোকদ্দমার তায়দাদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ছিদামপুরের বাবুরা নটবরকে মানিলেন সাক্ষী—সেই হইল প্রধান সাক্ষী, তার উপর মোকদ্দমা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাবুদের মোকদ্দমা দাঁড় করাইতে গেলে নটবরকে নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে হয়। তবু নটবর তাহাতে রাজী হইল, কেন না তখন তার সংসার একেবারে অচল।

ঢাকায় মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়া নটবর মনে মনে নানা রকম চিন্তা করিল। সে টাকার খাতিরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হইয়াছে বটে, কিন্তু—মিথ্যা কথাটা বলিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইল। অনেক সময় সে মিথ্যা কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কেমন গোলমাল হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই এবার মিথ্যা সাক্ষ্যটা দিয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধে মনে সন্দেহ হইতেছিল। না পারিলে বড় বিপদ! বাবুদের সঙ্গে কথা রহিল যে, সাক্ষ্য দিলে সে ৫০০৲ টাকা পাইবে—তাঁরা নগদ ১০০৲ টাকা দিয়াছেন, বাকী সাক্ষ্য হাকিম হইলে ঘরে উঠিবে। যদি সাক্ষ্য ঠিক মত দিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ টাকা বেবাক লোকসান হইবে। যে ১০০৲ টাকা হাতে আসিয়াছে, তাহা বাবুরা কিছুতেই আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন না সত্য—কিন্তু চিরদিনের একটা সম্বল যাইবে; কেন

না, এই বাবুদের কাছে দশ রকমে নটবর এটা ওটা সেটা পাইত। তাই সে মহা ভাবিত হইল।

এই ভাবনাই তাহার কাল হইল। না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে হয় তো চট করিয়া শিক্ষা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়া আসিতে পারিত; কিন্তু যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তার বুক দমিয়া যাইতে লাগিল। তাই তো— যদি না পারে! শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া নির্জ্জলা মিথ্যা বলিবার সংকল্প করিয়া গিয়া সে নির্জ্জলা সত্য বলিয়া আসিল। কাটগড়া হইতে নামিয়া সে মাথা গুঁজিয়া ছুটিল, আর এদিক ওদিক চাহিল না। সোজা ঘাটে গিয়া একখানা "গয়নার নৌকায়" গিয়া বসিয়া রহিল। তার সব গেল!

সন্ধ্যার সময় সে নৌকা ছাড়িল। ঠিক ছাড়িবার পরে একটি লোক মহা ডাকাডাকি করিয়া নৌকা ফিরাইয়া তাহাতে উঠিল। লোকটির গা খোলা, গলায় কাঠের মালা, এবং সূক্ষ্ম সোণার একটা হার, বেশ জুতসই একটি ভুঁড়ি এবং হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। লোকটি বসিয়াই চাদরের খুঁট দিয়া ঘাম মুছিয়া প্রচণ্ড বেগে চাদর ঘুরাইয়া আপনাকে ব্যজন করিতে লাগিল। তার ভুঁড়ির তাণ্ডব নর্ত্তন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ওর বড় দৌড়।"

নটবর এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তিকে দেখিতেছিল। ইহার সঙ্গে তার দেখা-শুনা ছিল না। তবে সে আন্দাজ করিতেছিল যে ইনিই বোধ হয় মহেশগঞ্জের সেই সাহা মহাজন। লোকটাকে দেখিয়াই তার ভারি কৌতুক বোধ হইল। সে একাগ্রচিত্তে এই ব্যক্তির ভুঁড়ির প্রচণ্ড বিক্ষোভ লক্ষ্য করিতে লাগিল। যেই ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছে, অমনি সে বলিয়া উঠিল, "আহা হা থামুন, ফাটবে।"

ভদ্রলোক চমকিত হইয়া সেদিকে চাহিলেন, বলিলেন, "কি ফাটবে?"

নটবর বলিল "দম।"

লোকটি একটু হাসিলেন। এতক্ষণে তিনি নটবরকে চিনিয়া বলিলেন, "আপনি বাঁশবনের নটবনের দাস না?"

নটবর বুঝিল, ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিয়া সুখী হইতে পারিল না। তার নিজের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সে আজ একটা দারুণ অপকর্ম্ম করিয়াছে—কেন না সে বোকা বনিয়াছে। রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি রাশি রাশি লোক রোজ রোজ আদালতে দাঁড়াইয়া কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যা বলিয়া যাইতেছে, আর সে এই সোজা একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া টাকাগুলি রোজগার করিয়া উঠিতে পারিল না, এ কি কম কলঙ্কের কথা! নটবর দাস সাধারণ কলঙ্ক গ্রাহ্য করে না। তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে লোকে সত্য মিথ্যা নানা কথা বলে, তা সে হাসিয়া উড়ায়। সে কাকে ঠকাইয়া টাকা লইয়াছে বলিয়া একটা মিথ্যা অপবাদ তার নামে রটিয়াছিল; তাহাতে সে রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু বেকুবীর অপবাদ সে সহ্য করিতে পারে না। আজ সে যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে লোকে তাকে এক নম্বর বেকুব বলিয়া সাব্যস্ত করিবে, এইটাই ছিল তার সব চেয়ে বেশী চিন্তা। তাই সে ধরা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় বড় বেশী ব্যস্ত ছিল। আর সে হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল ঠিক তারই কাছে যে নিজে স্বতঃ পরতঃ তাকে এমনি বেকুব বানাইয়াছে।

কিন্তু উপায় নাই। তার পিতৃদত্ত নাম এবং পৈত্রিক বাসস্থান উভয়ই স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

"আমার নাম কুঞ্জলাল সাহা—প্রাতঃ প্রণাম।" নটবর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল; তার পর বলিল, "আজ্ঞে না, ভোর হ'তে এখনো বাকী আছে।" তখন সবে সন্ধ্যা।

রহস্যটা কেহ বুঝিয়া উঠিল না। কুঞ্জলাল নটবরকে বড় আপ্যা-

স্থির করিলেন, এবং শেষে তাঁর বাড়ীর ঘাটে তাহাকে এক রকম জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। সাহা মহাশয় তাহাকে লইয়া সোজা গদীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি না, "দাস মশাই, ওরা আপনাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্ম কত দিতে চেয়েছিল ?"

কি অন্যায় উদ্ধত প্রশ্ন ! নটবর সত্য-সত্যই চটিয়া গেল। সে বলিল, "যদি টাকাই তারা দিতে চাইবে, তবে আমি তো তাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিতাম।"

কুঞ্জলাল হাসিয়া বলিল, "আর যদি টাকাই না দিতে চাইবে, তবে আপনিই বা এত রাস্তা কষ্ট করে যাবেন কেন ? আর তারাই বা আপনাকে এত তোয়াজ করে নিয়ে যাবে কেন—যদি আপনি এই সাক্ষ্যই দিতে গিয়াছিলেন ?"

এ কথার জবাব নাই। নটবর দেখিল যে, মিথ্যা কথা বলাটা তার আসে না। তাই সে ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া স্পষ্ট বলিল, "পাঁচশো টাকা।" কুঞ্জলাল তখন তাঁর সিন্দুক খুলিয়া কাগজপত্র, টাকাকড়ি রাখিতেছেন। নটবর লুব্ধ দৃষ্টিতে সিন্দুকের ভিতরকার নানা বিচিত্র মোড়কে ঢাকা জিনিসগুলি দেখিতে লাগিল।

একটা খাড়ুয়া-বাঁধা মোড়ক খুলিতে খুলিতে কুঞ্জলাল বলিলেন, "তাই তো, আপনার তো তবে বড় লোকসান গেছে।"

নটবর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। খাড়ুয়ার মোড়ক খুলিয়া একটা মোটা নোটের তাড়া বাহির হইলে, সে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কুঞ্জলাল কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিয়া, বাকী নোট আবার খাড়ুয়ায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "তা ছাড়া, বাবুরা তো এখন আপনাকে হয়রাণ ক'রতে ছাড়বেন না।"

এতগুলি টাকা নাড়া-চাড়া করিতে দেখিয়া সন্ত্র-লক্ষিত নটবরের বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলাইয়া গিয়াছিল, সে কিছু বলিল না।

তার পর—নটবর ঢোঁক গিলিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর সভ্যসভ্যই কুঞ্জলাল বাবু সেই বাইরেরাখা নোটের তাড়া লইয়া নটবরের হাতে দিয়া বলিলেন, "তা' আপনি আমার আজ যা উপকার ক'রেছেন, তার জন্য এই যৎকিঞ্চিৎ দিলাম। এর পর যদি কোনও বিপদ আপদে পড়েন, আমাকে খবর দেবেন।"

নটবর হাঁ করিয়া চাহিল—পাঁচশো টাকার নোট! অ্যাঁ! তার পর সে আর কোনও কথা না বলিয়া চোঁ চোঁ ছুট দিল। তার কেবলি ভয় হইতে লাগিল যে, সে আর দেরী করিলে হয় তো কুঞ্জলালকে বলিয়া বসিবে যে, একশো টাকা সে আগাম পাইয়াছে, এবং তাহা হইলে কুঞ্জলাল ১০০৲ টাকার নোট ফিরাইয়া লইবে। তাই সে চোঁচা ছুট দিয়া একেবারে অম্বিকার কাছে গিয়া পাঁচশত টাকার নোট তার সামনে ফেলিয়া দিল।

অম্বিকা অবাক্ হইল না। এ যে পাওয়া যাইবে, তা তো তার জানাই ছিল। এমন কি, এ টাকা দিয়া যে কি কি করিতে হইবে, তাহাও সে মনে মনে আঁটিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন নটবর সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল, তখন সে ধীরে সুস্থে অবাক্ হইল। নোটগুলি বাক্সে তুলিতে তুলিতে সে বলিল, "আচ্ছা বেকুব তুমি তো! পাঁচশো টাকার গলায় দড়ি দিয়েছিলে আর কি? ভাগ্যে কুঞ্জলালটা পাঁটা, তাই রক্ষে।"

যা' এতক্ষণ নটবর ভয় করিতেছিল তাই হইল। বেকুব বলিয়া তার গাল খাইতে হইল, তবে কি না গিন্নীর কাছে!

ছয়শো টাকা ফুঁয়ে উড়িয়া গেল। নটবর ও অম্বিকা দুজনে মিলিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া তাড়াইল।

অম্বিকা আগে হইতেই ঠিক করিয়াছিল যে, এই টাকা পাইলে সে একজোড়া বালা গড়াইবে, এবং নটবর ঠিক করিয়াছিল যে, ঘরখানায় টিনের চাল করা হইবে। সেই রাত্রে ঠিক হইয়া গেল যে দুই-ই করা হইবে। বালার দাম পড়িবে দুই শো টাকা। তাহা বাদে যে ৪০০৲ টাকা থাকিবে, তাহাতেই টিনের ঘর হইবে।

পরের দিন নটবর নিজেই একটা হিসাব করিতে বসিল যে, কি পরিমাণ টিন দরকার হইবে। তখন অম্বিকা বলিল, "ঘরখানা ক'রছো, একটু বড় ক'রেই করো।"

নটবরও তাই ঠিক করিয়াছিল। তার শুইবার ঘরখানা অত্যন্ত ছোট, তা' ছাড়া তার বসিবার একখানা ঘর নাই। আর তার ছেলে অবশ্য দেশে থাকে না, ঢাকায় দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া ঢাকার স্কুলে পড়ে। তা' সেও বড় হইতেছে, বাড়ীতে আসিলে তার শুইবার একটা আলাদা ঘর দরকার। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ব্যবস্থা করিল যে, একখানা বড় গোছের আটচালায় চার পাঁচটা প্রকোষ্ঠ করিয়া সব কাজ চালাইবে। সেই হিসাবে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক করিয়া সে পরের দিন ঢাকায় চলিল।

প্রথমেই সে সোণা কিনিয়া স্যাকড়া-বাড়ী স্ত্রীর বালা গড়িতে দিল। তার পর অবশিষ্ট টাকা লইয়া সে টিন কিনিতে গেল। সে দোকানদারদের কাছে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ জানাইলে, তাহারা হিসাব করিয়া যাহা বলিল, তাহা নটবরের নিজের হিসাবের অনেক বেশী। নটবর দেখিল যে, তার যে টাকা আছে, তাঁতে টিন কেনা যায় বটে, কিন্তু সেই টিন কায়-ক্লেশে বাড়ীতে পৌছান ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কাঠ কিনিয়া ঘর তুলিবার খরচ আর হাতে থাকে না। ভাবিল, আগেই বালাটা না গড়াইলেই হইত।

দোকান হইতে ফিরিয়া সে নানা রকম চিন্তা করিয়া ঘরের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সে সংবাদ পাইল যে, একজন ঠিকাদার পুরাতন টিন বিক্রয় করিবেন; সে গিয়া দেখিল, দর নূতনের চেয়ে কিছু সস্তা; সে আবশ্যক মত টিন কিনিয়া ফেলিল। ঝরঝরে পুরানো কতকগুলি টিন আসিয়া আমবাগানে মজুত হইল। কাঠের জন্য বাকী টাকা সে একটী লোককে দিল। সে লোক কাঠ কিনিতে গিয়া আর বাড়ী ফিরিল না।

টাকাগুলি নিঃশেষ করিয়া দিয়া নটবর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। টিনগুলি পড়িয়া রহিল। কাঠ আসিল না। বালা তৈয়ার করিয়া স্যাকরা তাড়ার পর তাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু মজুরীর টাকা হাতে নাই বলিয়া বালা আনা হইল না। বৎসর খানেক বাদে স্বর্ণকার খবর দিল যে, নটবরের বালা সে ভাঙ্গিয়া সোণা বিক্রী করিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণকারের মজুরী বাদে ৪০৲ টাকা উদ্বৃত্ত আছে, নটবর যেন তাহা লইয়া যান। এত বড় বেকুব বনিয়া আর নটবর কেমন করিয়া সেদিকে ভিড়িবে? তাই সে ও-অঞ্চলে গেল না, টাকাও আদায় হইল না।

অনেক দিন পরে কতকগুলি পাওনাদারের উৎপীড়নে নটবর রাগ করিয়া তাহাদিগকে টিনগুলি জলের দরে বিলাইয়া দিল।

২

টিনগুলি বিদায় হ'তে নটবর বলিল, "বাঁচা গেল! গরীবের ঘোড়া রোগ, এত অল্পে যে নিষ্কৃতি হ'ল এই ভাল!"

অম্বিকা বলিল, "হাঁ! টিনের ঘরও হ'ল, গয়নাও হ'ল। এখন আমার আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল যে দূর হ'ল, তাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ওগুলোর দিকে চাইলে আমার প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠতো।"

"বাঁচা গেছে। টিন কাজ থেকে নেই। তা ছাড়া, খড়ের ঘর দিব্য ঠাণ্ডা, টিনের ঘর তো নয়, যেন আগুন।" কাজেই সুস্থ সাব্যস্ত চিত্তে তারা মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

নটবরের ঘরে অনেক জিনিসেরই অভাব ছিল, ছিল না কেবল আনন্দের। হাসি তাদের মুখে লাগিয়াই আছে। ভারী ভারী শক্ত শক্ত কথা লইয়াও নটবর রহস্য না করিয়া পারিত না; ভারী দুঃখের ভিতরও একটা হাসির কথা মনে হইলে সে না বলিয়া পারিত না। তাই অম্বিকা দিন রাত হাসিমুখেই থাকিত। স্বামীর উপর কোন দিন রাগ করিতে পারিত না।

এমন দিন গিয়াছে, যে দিন চালের ডোলে হাত দিয়া অম্বিকার চক্ষে জল আসিয়াছে। বড় দুঃখে সে নটবরের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিয়াছে, "থাক, এমনি বসে' থাক; রোজগারে কাজ নেই। আজ কি গিলবে গেল গে দেখি।"

নটবর ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ প্রেয়সী, মান্যের অপমান করো না!"

"কি আমার মান্য রে! যে খেতে পায় না, তার আবার মান কি?"

"আহা, তার কথা বলছি না! আমি! আমার কথা চুলোয় যা'ক, কিন্তু ওই যে আহার ব্যাপারটা, যাতে করে আমাদের জীবনধারণ হয়, তাকে বল্লে কি না গেলা—এমন অসম্মান করো না দেবি!"

"আহা, উনি এখন নাটক ক'রতে ব'সলেন।" বলিয়া অম্বিকা হাসিল। নটবরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া, তার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। যে দুটী চাল ছিল, সে তাই হাসিমুখে চড়াইল। দুই জনে দুই গ্রাস খাইয়া মনের আনন্দে গল্প করিতে লাগিল।

এ আনন্দ কিছুতেই টুটে না। নটবরের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—বেশ একটু খারাপ। লোকের মুখে সে কথা শুনিয়া অম্বিকা একটু রাগ করিত। স্বামী বাড়ী আসিলে অনুযোগ করিত, কিন্তু রাগ রাখিতে পারিত না। নটবর তাহাকে এমন করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিত যে, অম্বিকা একেবারে গলিয়া গেল। ইহার পর অন্য কোনও স্ত্রীলোক তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, সে বলিত, "পুরুষ মানুষ, ওতে আর কি হ'য়েছে।"

প্রতিবেশিনী আরও বুঝাইতে বলিত, আরসীর ভিতর আমার মুখ এক-আধ দিন দেখেছি দিদি; বলতে কি, আমারই তাতে প্রাণ আঁৎকে উঠে। তাও তো উনি আমার কাছে আসেন!"

আসল কথা, নটবরের উপর রাগ করা অম্বিকার পক্ষে অসম্ভব ছিল। খুব রাগের মুখে নটবর এমন একটা হাসির কথা বলিত, বা এমন একটা হাসির কাণ্ড করিত, যে, না হাসিয়া তার উপায় থাকিত না।

কাজেই দারুণ অভাবের ভিতর থাকিয়াও নটবর ও অম্বিকা হাসিয়াই দিন কাটাইত। কিছুতেই তাদের মনের ভিতর দাগ বসাইতে পারিত না।

একখানা ছেঁড়া ময়লা ঢাকাই শাড়ী পরিয়া অম্বিকা তার শুইবার

ঘরের দাওয়ায় মাছ কুটিতে বসিয়াছিল। নটবর বাড়ী আসিয়া তাই দেখিয়া বলিল, "যা'ক, বেশ সুবিধা ক'রেছ, এর পর বিছানায় শুয়েই সব কাজ কর্ম্ম খাওয়া দাওয়া হ'বে। কষ্ট করে আর উঠতে হ'বে না।"

অম্বিকা বলিল, "আহা! এতে কিই বা হ'য়েছে। দুটো এই মাছ কুটতে হ'বে, দা'খানা এখানে র'য়েছে, আবার ওইখানে টেনে নিয়ে যাব, তা' এখান থেকে কুটে নিচ্ছি।"

"না, না, ঠাট্টা নয়, আমরা এখন যে রকম বড়মানুষ হ'তে যাচ্ছি, তা'তে খাটে শুয়ে না খেলে মানাবে কেন? জান কি হ'য়েছে?"

অম্বিকা। কি?

চোখমুখে গম্ভীর একটা ভঙ্গী করিয়া নটবর বলিল, "হাজার টাকা।"

হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আবার কি মিথ্যা সাক্ষী না কি? সে কাজ—"

"আরে না না, লক্ষ্মী কি দুইবার এক রকমে দেখা দেন? তাঁর বেশ একটু মৌলিকতা আছে।"

"তবে এবার তাঁর কি রূপ?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "বিয়ে।"

অম্বিকার প্রাণটা চমকিয়া উঠিল; তবু সে হাসিয়া বলিল, "আ মরণ? কুষ্টিখানা আজকালের মধ্যে দেখেছিলে? বয়সের হিসাব খেয়াল আছে?"

নটবর হাসিয়া বলিল, "এই নাও! এতেই হিংসেয় পেট ফাটে। আরে শোনই আগে, কার বিয়ে!"

"কার?"

"তোমার ছেলের! সতীশের।"

অম্বিকার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাই না কি? কোথায়? বল আমায়। হাজার টাকা দেবে?"

তখন নটবর ক্রমে খুলিয়া বলিল। মেয়ের বাপের বাড়ী ঢাকা সহরে। সেখানে সে কি একটা চাকরী করে। তা ছাড়া, বিষয় সম্পত্তি আছে, অবস্থা বেশ ভাল। তার একটি মেয়ে আছে, ভদ্রলোক সতীশের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চান। বিবাহের ব্যয়, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাবদ তিনি নবলগ হাজার টাকা দিবেন, তা ছাড়া কিছু দানও দিবেন, মেয়ের গায়ও দু'খানা গহনা দিবেন। তা ছাড়া, সতীশের সমস্ত পড়ার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, সে শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পড়িবে।

অম্বিকা লুব্ধ হইয়া উঠিল। তার কাঙ্গাল ছেলের এমন বিবাহ! তার মনে হইল, এইবার তাদের দুঃখের দিন শেষ হইল। হাজার টাকায় তাহাদের জন্মের মতন স্বচ্ছলতা লাভ হইবে, আর ছেলে বউ বড়মানুষ শ্বশুরের বাড়ীতে পায়ের উপর পা দিয়া বাস করিবে। আর চাই কি?

কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা, মেয়েটি দেখিতে কেমন?

সে বিষয়ে নটবরের কোনও নিরপেক্ষ অভিমত দেওয়া অসম্ভব। মেয়ে সে দেখিয়াছে, কিন্তু ঐ হাজার টাকা এবং ছেলের পড়ার খরচ প্রভৃতি তার চারিধারে এমন একটা মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তার ভিতর দিয়া সে কিছুই দেখিতে পারে নাই; তার মনে চাপিয়া বসিয়াছিল এই ধারণা, যে মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু বাস্তবিক সে সুন্দরী নয়। মাত্র তেরো বছরের মেয়ে, নিতান্ত কচি, তাই তার ভিতর কৈশোর সুলভ লাবণ্য একেবারে না আছে তা নয়; কিন্তু তার রং কালো এবং মুখ চোখ ভালো নয়। তার শরীর এখনো গড়িয়া ওঠে নাই। কাজেই শরীরের গড়ন বিষয়ে কোনও মতামত এখন দেওয়া চলে না।

কিন্তু নটবর অম্লান বদনে বলিল, "মেয়ে যেমন ভদ্রলোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

কথাটা অম্বিকার মনঃপূত হইল না। সে বলিল, "তার মানে সুন্দরী নয়।"

"হাঁ, তেমন কি একটা ডানা-কাটা পরী?—এই যেমন ভদ্রলোকের ঘরে হ'য়ে থাকে।"

"ভদ্রলোকের ঘরে তো কত রকমই হয়। ভটচাজ বাড়ীর নতুন বৌও হয়, আর আমার মতন রূপসীও হয়। তা ছাড়া, ডানা-কাটা পরী যদি হয় তো সে ভদ্র ঘরেই হয়, সে কিছু মাঝি মাল্লীর মধ্যে হয় না।"

কথাটা শুনিয়া নটবর একটু খোঁচা খাওয়া মত করিয়া একবার চাহিল। তার মনে হইল যে, কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। মাঝিপাড়ার কোনও বিশেষ ঘরে তার একটু অবৈধ গতিবিধি আছে, সে কথা সবাই জানিত। কিন্তু কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া নটবর বলিল,

"কেন, তোমার রূপ কম কিসে ছোট বৌ?

একটু হাসিয়া অম্বিকা বলিল, "আ মরণ! ঠেকাব করে কথা চাপা দিতে হবে না। আমার যা রূপ, তা' আরসীর দিকে চাইলেই আমি দেখতে পাই। তা' এখন এ মেয়ে কেমন তা'ই বল। রং কেমন?"

"আরে রঙের মধ্যে আছে কি? কতকগুলো ফরসা রঙ হ'লে কি পরমার্থ হয়? ওই তো রং আছে প্রাণকুমারের বউর, সে কি রং নিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে? চাই লক্ষ্মীশ্রী। তোমার যে রং ময়লা, তা কি তুমিই কিছু কষ্টে আছ, না, আমারই রোজ বুক ফেটে যাচ্ছে?"

"আচ্ছা, বোঝা গেল রং ফরসা নয়। তবু কেমন কাল, আমার মত, না পাঁচীর মত, না"—

"আরে না না, এই ভদ্রঘরে যেমন হ'য়ে থাকে—এই ধর আমার মতন।"

নটবরের রং অম্বিকার চেয়ে ফরসা কি কালো, সে সম্বন্ধে মতভেদ

ছিল। অবস্থা বিশেষে নটবর মনে করিত, তার রং অন্ততঃ অম্বিকার চেয়ে একটু ফরসা, এবং অম্বিকা মনে করিত ঠিক উল্টা। কিন্তু যখন মেজাজটায় প্রেমের মাত্রা একটু চড়িয়া থাকিত, তখন নটবর মনে করিত অম্বিকা অন্ততঃ তার চেয়ে ফরসা, আর অম্বিকা ভাবিত যে নটবর স্বর্ণকান্তি সুপুরুষ। বর্ত্তমান সময়ে অম্বিকার সে অবস্থা ছিল না। কাজেই অম্বিকা বলিল, "বুঝলাম, তুমিই যখন এ কথা ব'লছো, তখন সে মেয়ে পাঁচার চেয়েও কালো না হ'য়ে যায় না। আমি কালো বউ আর এ বাড়ীতে আনবো না।"

যেদিন সতীশের জন্ম হয়, সেই দিন হইতে অম্বিকা স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটি কুটকুটে বউ তার আঙ্গিনায় ঘুর ঘুর করিয়া কাজ করিতেছে। সেই স্বপ্নটা এখন খুব জোর করিয়া তাহার অন্তরকে এই প্রস্তাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

নটবর তার অভ্যস্ত রসিকতার সহিত নানা কথার অবতারণা করিয়া অম্বিকার এ বিদ্রোহ জল করিয়া দিল। বিশেষ করিয়া এই হাজার টাকায় যে কত কি অসম্ভব কার্য্য করা যাইবে, তাহার কল্পনায় অম্বিকা গলিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত অম্বিকা সম্মত হইল।

সতীশকে লইয়া প্রথম একটু বেগ পাইতে হইল। সে সবে ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছে। তার এখন বিবাহ করিবার মোটেই গরজ ছিল না। তার আশা ছিল যে, সে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া একটা মস্ত বড় চাকরী করিবে, এবং সময়ে উপাখ্যানের রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক লইয়া বিবাহ করিবে। সে বলিল, চাকরী না করিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। তার শ্বশুর বাড়ীর পক্ষের লোক তাহাকে বুঝাইল যে, ভাল চাকরী করিতে হইলে তার পড়াশুনা শেষ করা দরকার। বিবাহ না করিলে তার পড়ার খরচ চলিবার কোনও সম্ভাবনাই

নাই। কাজেই তাকে পড়া ছাড়িয়া এখনি চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। বরাতের খুব বেশী জোর থাকিলে, সে যে চাকরী পাইতে পারে, তার মুনাফা ১০৲ টাকার বেশী হইবে না। পক্ষান্তরে, তাহার শ্বশুর তাহাকে যতদূর ইচ্ছা পড়াইবেন। কালে পাশ করিয়া সে ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি যা' ইচ্ছা তাই হইতে পারিবে।

সতীশ টলিল না।

তার পর একটু গোল হইল। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিয়া সতীশ পড়িত, তাঁর একটি নিকটতর আত্মীয় ঢাকায় পড়িতে আসিল। তাই তিনি প্রথমে সতীশকে বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তার পর কিছু করিতে না পারিয়া পরিষ্কার বলিলেন যে, সতীশকে আর তিনি রাখিতে পারিবেন না।

সতীশ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। সে বাপের কাছে এক পয়সাও সাহায্য পায় না। এই বাড়ীতে থাকিয়া সে খায়, আর এক বাড়ীতে ছেলে পড়াইয়া তার নিতান্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করে। এমনি করিয়া সে হাতে কিছু টাকা জমাইয়াছিল; তাহা সে নিঃশেষ করিয়াছে পরীক্ষার ফিস দিতে এবং একান্ত দরকারী থান কয়েক বই কিনিতে। এখন এ বাড়ী ছাড়িতে গেলে তার পড়া বন্ধ করিতে হয়। সে ভয়ানক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এ-দিক সে-দিক ঘুরিয়া সে মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্যের জোগাড় করিল, কিন্তু তাতে তো কোথাও থাকা আর খাওয়া কুলায় না। কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে অনেক প্রকারে দরবার করিয়া একটা বৃত্তির চেষ্টা করিল, অনেক ঘোরাঘুরির পর প্রিন্সিপ্যাল অস্বীকার করিলেন।

হতাশ হইয়া সতীশ রমণার মাঠে গিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া সে মন স্থির করিয়া পিতার কাছে চিঠি লিখিল যে, তার পড়ার ব্যবস্থা হইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

বিবাহ হইয়া গেল। নটবর হাজার টাকার মধ্যে ৫০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া বাড়ীতে তার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত টিনের ঘর বেড়া ইত্যাদি করিল। রান্নাঘর নূতন করিয়া বাঁধিল, বাড়ী-ঘর-দুয়ারের সংস্কার করিল। তার পর প্রায় তিন শত টাকা ঋণ করিয়া সে বেশ সমারোহ করিয়া বিবাহ ব্যাপার নিষ্পন্ন করিল। বিবাহের সময় বৈবাহিক তাহাকে নগদ তিন শত টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা সতীশের নামে সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিবেন বলিলেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, সে টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে এখনো জমা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া নটবর তিনশো টাকা শেষ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না। এথম বউ লইয়া ঘর করিতে হইবে, তার কাছে নিত্য নিত্য অভাব অনাটন দেখানটা সঙ্গত হইবে না,—কেন না বউ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে। কাজেই এ তিনশো টাকা হাতে রাখা ভাল। হাওলাতি তিনশো টাকার জন্য সে দুখানা ক্ষেত বন্ধক দিয়া তমঃশুক দিল।

ছয়মাসে তিনশো টাকা ফুঁকিয়া গেল। তবে তার মধ্যে একশো টাকা দিয়া অম্বিকার জন্য একজোড়া কলি হইল। বড় ঘরের মেয়ে ঘরে আনিয়া শাশুড়ীর সুধু শাঁখা হাতে থাকাটা তো ভাল দেখায় না—তাতে একটু হীনতা স্বীকার করিতে হয়। এদিকে তমঃশুকের টাকা গোকুলে বাড়িতে লাগিল। ঋণের টাকা যাহা হইতে পরিশোধ হইবে, সে উদ্বৃত্ত অর্থ নটবরের হাতে কোনও দিনই থাকে নাই। কাজেই ঋণ শোধ হইল না। মহাজন ক্রমে জোত দুইখানায় টান দিতে, নটবর মাথা চুল-কাইতে চুলকাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে গিয়া হাজির হইলেন। সে জোত দু'খানা ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মত্রের ভিতর, কাজেই তিনি সম্মতি না দিলে মহাজন কিছুই করিতে পারে না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "জমা না হয় বেচতে না দিলাম আমি, কিন্তু টাকার উপায় কি? টাকা কটা শোধ করে না দিলে তো সে তোমার ঘরখানা নিয়ে যেতে পারে, তোমাকেও কয়েদ ক'রতে পারে। তখন টাকার একটা জোগাড় কর, আমি তোমার মহাজনকে আপাততঃ ঠেকিয়ে রাখছি।"

নটবর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাড়ী ফিরিল। অম্বিকা শুনিয়া বলিল, "তার জন্য চিন্তা কি? আমার কলি বেচে টাকা শোধ দিয়ে ফেল।"

নটবর বলিল, "তাতে না হয় শ'খানেক গেল, বাকী দুশো'!"

সুদের কথাটা তার খেয়াল হইল না।

অম্বিকা বলিল, "আচ্ছা, এ একশো তো দিয়ে ফেল। তার পর সমস্ত পাওয়া যাবে।"

নটবর কলি বেচিতে গেল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ষাট টাকার বেশী কিছুতেই হইল না। ষাট টাকা লইয়া সে মহাজনের কাছে যাইতেই, মহাজন সুদ কষিয়া দেখাইল যে, সেই তারিখ পর্য্যন্ত সুদ দুইশো টাকা পাওনা হইয়াছে। ষাট টাকা সুদ ওয়াশিল দিয়া, বক্রী টাকা চক্রবৃদ্ধির চুক্তি অনুসারে আসল মধ্যে গণ্য করিয়া সে নটবরকে বিদায় দিল।

বাজারের মধ্যে মহাজনের গদীতে এই কারবার হইতেছিল। সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া নটবর বসিয়া পড়িল। জোতখানা বুঝি আর কিছুতেই থাকে না! এখন উপায় কি?

নটবরের মনে বিষাদ বা নিরাশা বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদি মহাজনকে আর দুই বৎসর ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আর তার চিন্তা নাই। যদি চ সতীশ দুইবার আই-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া তৃতীয় বারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তবু সে বি-এ পড়িতেছে। বি-এ-তে সে অনায়াসে পাশ করিবে, এ কথা সে বলিয়াছে। তবে তো দুই বৎসর পরে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না। বি-এ পাশ করিয়া সতীশ দু'শো পাঁচশো অনায়াসে রোজগার করিয়া এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। আর, না হয় তখন জমিখানা গেলেও কিছু ক্ষতি হইবে না; কেন না, সতীশ তো তখন সমস্ত পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে।

এই স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় সম্মুখে দেখিল, কুঞ্জলাল সাহা।

কুঞ্জলাল হাসিয়া বলিল, "প্রাতঃ প্রণাম, দাস ম'শায়।"

নটবর গম্ভীর ভাবে বলিল, "সাহাজী, আপনি একটু পয়সা খরচ করে একটা ভাল ঘড়ি কিনুন; আপনার সময়ের বড় দিগ্‌ভ্রম হয়।"

কুঞ্জলাল বলিল, "সন্ধ্যাবেলায় প্রাতঃ প্রণাম বল্লে এমন কিছু দিগ্‌ভ্রম

হয় না দাস ম'শায় ; কিন্তু আপনার দিগ্‌ভ্রমটা গুরুতর—আপনার একটা চশমা দরকার।"

"কেন? আমার দিগ্‌ভ্রমটা কোথায় দেখলেন?"

"দিগ্‌ভ্রম নয়! টাকা ধার ক'রতে হ'বে, যাবেন—আমার কাছে, না পথ ভুলে নফর সা'র কাছে এসে হাজির।"

নটবর একটু হাসিল, কিন্তু সে বড় শুষ্ক হাসি!

কুঞ্জলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা ধার ক'রেছেন এখানে?

"এই বেশী নয়, সামান্য কিছু টাকা। এই তার সুদ দিয়ে গেলাম।"

কুঞ্জলাল বলিল, "শ'দুই? আচ্ছা, আপনি ও টাকা দিয়ে ফেলুন, আমার কাছে নিয়ে যান।"

মাথা চুলকাইয়া নটবর বলিল, "তা ছাড়া, সুদ কিছু আছে"—

"সুদের হার কত!"

"মাসে দু'টাকা।"

"আচ্ছা, না হয় দিয়ে তমঃশুক নিয়ে আসুন।"

নটবর বলিল, "দেখুন, একটু গোল আছে। এ টাকার সুদ বোধ হয় আর আমি দিয়ে উঠতে পারবো না, কাজেই জমী দুখান ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় ভাল।"

কুঞ্জলাল তখন তাঁহার কাছে খুঁটাইয়া সকল সংবাদ লইয়া পরামর্শ দিল যে, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে জমী দায়শোধী বন্ধক দিয়া ঋণ শোধ করাই ভাল। দশ বৎসরে ঋণ শোধ হইয়া জমী ফেরত আসিবে, ইহার মধ্যে আর কিছু দিতে হইবে না।

সন্ধ্যার সময় সেই সর্ত্তে দায় শোধী দিয়া, কুঞ্জলালের টাকায় নফর সা'র ঋণ শোধ করিয়া, নটবর উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

এদিকে ঢাকায় সতীশের অবস্থা ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িল।

তার শ্বশুরের সঙ্গতি সম্বন্ধে নটবর দাস যে পরিচয় পাইয়াছিল ও আন্দাজ করিয়াছিল, তাহা ষোল আনা সত্য নয়। তিনি সামান্য চাকরী করিলেও নানারকম অবৈধ উপায়ে তাহা হইতেই প্রায় শ'দেড়েক টাকা মাস মাস উপায় করিতেন। তা'ছাড়া তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বৎসরে পাঁচ ছয় শো টাকা আয় হইত। এই আয় লইয়া তিনি একটি বৃহৎ পরিবার পালন এবং চার পাঁচটি ছেলে মানুষ করিয়া, এবং বেশ একটু ভাল খাইয়া পরিয়া এমনিই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া আরও ঋণে জড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সংসার অচল হইয়া উঠিল। কাজেই জামাইকে দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে খুব লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি করিলেও, কার্য্যস্থলে তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না! বিশেষতঃ সতীশ বার বার ফেল হওয়ায় আর তিনি মোটেই পারিয়া উঠিলেন না। শেষে তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, তার পড়ার খরচ তিনি দিতে পারিবেন না, বাড়ীতেও তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না।

স্বামী স্ত্রী দুজনে ইহাতে চক্ষে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু অপমানের জ্বালায় তাদের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। সতীশের স্ত্রী বলিল "আমাকে বাঁশবনে রেখে এসে তুমি যা' হয় একটা কর। আমি এ বাড়ীতে আর থাকবো না।"

যেদিন নটবর তার জমী দায়-শোধী বন্ধক দিয়া উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ী আসিল, তার দুই দিন পরে সতীশ বিনা সংবাদে তার স্ত্রীকে লইয়া আসিল। সমস্ত অবস্থা শুনিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য নটবরের চক্ষু স্থির হইয়া উঠিল। জমী দায়শোধী দিয়া তার আয় অর্দ্ধেক হইয়া গেল, কিন্তু তার পোষ্য বাড়িয়া গেল—কেবল বউমা একা নন, তার একটি পুত্র কোলে আর একটি গর্ভে। কিন্তু টাকা পয়সা বা ভবিষ্যতের চিন্তা যদি নটবরের মনে বেশীক্ষণ ঘর করিতে পারিত, তবে নটবরের এ দুঃখ থাকিত না,

সে এতদিন একটা কিছু করিয়া খাইতে পারিত। এ সব বিশ্রী চিন্তা তার উজ্জ্বল আনন্দ-বহুল অন্তরে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এই আনন্দে যে, তার বউমা স্বামীর অপমানে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী জন্মের মত ছাড়িয়া তার এই কুঁড়েখানিতে আশ্রয় লইয়াছে। সে মহা উল্লাস ও উৎসাহের সহিত বধূকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। অম্বিকাও সমস্ত ঘরময় আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখন তো আর তাহাদের ঋণ নাই, কোনও মতে একটা উপায় হইবেই! নাতি কোলে করিয়া তাদের অন্তর জুড়াইয়া গেল।

সতীশ ঢাকায় ফিরিয়া গেল। সেখানে নানারকম কাজকর্ম্ম, ভিক্ষা প্রভৃতি করিয়া কোনও মতে আর এক বৎসর পড়ার বন্দোবস্ত করিল।

৪

তখন শ্রাবণের শেষ। পাটের ক্ষেত ফসলে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে—জোতদারদের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল; আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাট কাটা হইবে। এবার ফসলও ভাল হইয়াছে, দামও ভাল হইবে শোনা যাইতেছে। যা'দের জোত জমি আছে, তাদের মধ্যে এ সব কথা লইয়া প্রায়ই আন্দোলন হইত। সবাই সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে, এবার লক্ষ্মী ঘরে উঠিবেন।

নটবর যেখানে যায়, সেইখানেই পাটের কথা শোনে। কার ক্ষেতে কয় মণ পাট উঠিবে, কি রকম দর হইবার সম্ভাবনা, এ সব কথার আলোচনা হয়। তার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করে। তাই তো, এমনি সময় সে দায় শোধী বন্ধক দিয়া দখল ছাড়িয়া দিল। আর একটা মাস থাকিলেই তো সে অনেকগুলি টাকা ঘরে তুলিতে পারিত; তাহা হইতে মহাজনকেও ঠেকাইয়া রাখা যাইত, বছরকার খরচও বোধ হয় চলিয়া যাইত। নদীর ধার দিয়া চলাচল করিতে সে দেখিতে পাইত, তার হাতছাড়া সেই ক্ষেত পাটে একেবারে ঠাসাঠাসি হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সে জমীর পাট লম্বায় সবাইকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। সে জোর করিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু ফিরাইত। আর একখানা ক্ষেত ধানে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, ধানের ডগায় কচি শিষ্ বাতাসে দোল খাইয়া যেন তাকে পরিহাস করিতেছে। এমন ফসল তো তার দশ বছরের মধ্যে হয় নাই। নটবর চক্ষু মুদিয়া ছুটিয়া পলাইত।

পাট কাটা হইল; গৃহস্থের আঙ্গিনা সব শুকাইবার জন্ত টাঙ্গান পাটে বোঝাই হইয়া গেল, ফড়িয়াগণ ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। বন্দরে বন্দরে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাটের নৌকা জমিয়া, বিপুল আলস্যের সহিত কেবল বস্তা বস্তা পাটে তাহাদের উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিল। এবার চারিদিকে কেবল পাট—পাট—পাট! ঘরে ঘরে পাটের গন্ধ আর টাকার ঝন্‌ঝনানি। নটবর ক্ষেপিয়া উঠিল।

একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া পথে বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল যে, তার সেই হাতছাড়া জমীর পাট তখনও কাটা হয় নাই, বর্গাদার সেখানে ঘোরা ফেরা করিতেছে, কাল কাটিবে বোধ হয়। নটবর রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল কুঞ্জ সাহার কাছে।

কুঞ্জ সাহার গদী এখন সরগরম। তার গুদাম পাটে বোঝাই, তার আঙ্গিনায় পাট শুকাইতেছে। গদীর ভিতর ফড়িয়া ও কর্ম্মচারীর দল ঘুরিতেছে, টাকা ঝনঝন করিতেছে। পাটের মরসুমে কুঞ্জসাহা একেবারে ভরপুর।

নটবরকে দেখিয়া কুঞ্জলাল একবার তার দিকে চাহিয়া বলিল, "দাস-ম'শায় যে! বসুন।" ময়লা ফরাসের এক কোণায় নটবর বসিয়া রহিল। সবাই একবার একবার করিয়া তাহাকে দেখিল, পরিচিতেরা নমস্কারাদি করিল, তার পর যে যার কাজ ও কথায়-বার্ত্তায় লাগিয়া গেল। নটবর যে সেখানে আছে, সেটাও কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া নটবর ভারি অপমানিত বোধ করিল। একে তার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল, তাতে আবার এই অপমান। তার চিত্তের সহজ প্রসন্নতা তাহাকে পরিহার করিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে একটা রসিকতা করিয়াও মনের বোঝা নামাইতে পারিল না। যেখানে তার মুখে হাস্যরসের ফোয়ারা ছোটে, সেখানে সে মাথা খুঁড়িয়া একটা হাসির কথা বাহির করিতে পারিল না।

নটবরের বড় ঘৃণা বোধ হইল। সে আজ কুঞ্জ সাহার কাছে অনুগ্রহ-

প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। কুঞ্জলাল আগে বড় বেশী সহৃদয়তা দেখাইয়াছিল বলিয়াই সে আসিয়াছিল, নহিলে লোকের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষার অপমান সে কোনও দিনই সহ্য করে নাই। নটবরের মনে সন্দেহ রহিল না যে, কুঞ্জসাহাও জানে যে, সে তার কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, তাই তার এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন।

অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া নটবর উঠিল। কুঞ্জসাহার নজর সেদিকে পড়িতেই সে বলিল, "দাসম'শায় উঠছেন? একটু বসুন। এঁর সঙ্গে কথাটা সেরেই আপনার কথাটা শুনছি। আমারও আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

নটবর বাধ্য হইয়া বসিল। কুঞ্জসাহার চাল দেখিয়া তার রাগ হইল, কিন্তু কোনও কথা জুয়াইল না।

অনেকক্ষণ পরে কুঞ্জ উঠিয়া তাহাকে একটু নিরিবিলি যায়গায় লইয়া গিয়া বলিল, "হাঁ দেখুন দাসম'শায়, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম। আপনার জমী দুখানা তো দিয়ে ব'সেছেন, এখন আপনার সংসার চলবে কিসে?"

লজ্জায় নটবরের কাণ লাল হইয়া উঠিল। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে অপমান করিবার অধিকার নটবরই তো কুঞ্জকে দিয়াছে।

আত্মসংযম করিয়া নটবর বলিল, "তা যাবেই চলে এক রকম।" তার এখন ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, এই কথা বলিয়া কুঞ্জসাহার কাছে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল যে, সে যেন তার দায়শোধী দলিলমূলে দখলটা এ সনের ফসলটা বাদ দিয়া আমলে আনে। তাহা হইলে এবারকার ফসলটা নটবর পায়, তাহাতে এক বছরের খোরাক চলিয়া যাইবে; এমন ভিক্ষা করিবার মতি যে তার হইয়াছিল, সেজন্য নটবর আপনাকে মনে মনে চাবুক মারিতে লাগিল।

কুঞ্জলাল বলিল, "আপনার ছেলে এখন কি করে?"

"এবার বি-এ দেবে, সে ঢাকায় পড়ে।"

"তাই না কি? আমি ভাবছিলাম যে, যদি তাকে এনে এই মরসুমে আমার কাছে পাটের কাজে লাগিয়ে দিতেন, তা'হ'লে বোধ হয় কিছু সুবিধে ক'রতে পারতো।"

সুবিধা যে হইত, সে বিষয়ে নটবরের সন্দেহ ছিল না। আর ব্যবসায়ে এমন একটা সহায়ের সুযোগ পাওয়া খুব সুলভ নয় তাও নটবর জানিত। কিন্তু তার ভয়ানক রাগ হইল এই কথা ভাবিয়া যে, কুঞ্জ সাহা তাহাকে অনুগ্রহ দেখাইতে আসিয়াছে। কুঞ্জ সাহার দয়ার দান গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল বলিয়া তার মনে হইল।

নটবর বলিল, "না সাহাজী, তার এখন মিলিটারী মেজাজ, সে বি-এ, এম-এ পাশ করে' কত কি ক'রবে! তার শ্বশুর তাকে খরচ দেয় কি না?" "ও তাই না কি" বলিয়া কুঞ্জলাল নীরব হইল।

নটবরের অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। কুঞ্জ সাহা নটবরকে অনেকটা অনুগ্রহ করিয়াছে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। নটবরকে দেখিয়াই তার মনে হইল যে, নটবর বুঝি তার কাছে আরও টাকা ধার চাহিতে আসিয়াছে। ইহাতে সে বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করিল। একবার কি দুইবার সে ইহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছে বলিয়াই চিরদিন তো সে দাস মহাশয়ের সব ভার গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই এ দায় হইতে স্থায়ীভাবে মুক্ত হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল এই বুদ্ধি। নটবরের ইহা মনঃপূত হইল না দেখিয়া সে চুপ মারিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কুঞ্জ সাহা জিজ্ঞাসা করিল, "তা' আপনি কি মনে করে' এসেছিলেন?"

"কিচ্ছু না, এই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম সাহাজীর সঙ্গে একটু আলাপ সালাপ করে যাই। তা' দেখলাম, ম'শায়ের মুখ চোখ নাক কাণ একেবারে পাটে গাদা হ'য়ে গেছে।"

এই রসিকতাটুকু করিতে পারিয়া নটবর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তার প্রাণটা একটু হাল্কা হইল। সে সাহাজীর সঙ্গে আর দুই একটা কথা বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। পথে ফিরিতে সে তার সেই পাটক্ষেতের ধার দিয়া গেল। একবার সেদিকে চাহিয়া সে চক্ষু বুজিয়া ছুট দিল।

যখন সে চক্ষু মেলিল তখন দেখিতে পাইল, গোপাল ভাণ্ডারী তাহাকে সাপটিয়া ধরিয়াছে।

গোপাল ভাণ্ডারী মস্তবড় ধড়িবাজ। পাশের গাঁয়ের সান্ন্যাল মহাশয়দের কাজ করে সে, আর গ্রামের ভিতর দুষ্ট-বুদ্ধির মহাজনী করে। গোপাল ভাণ্ডারীর সঙ্গে গ্রামের শরৎ দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর একটু গোলযোগ লইয়া তখন গ্রামে বড় গোলযোগ চলিতেছে; কেহ বড় তার সঙ্গে কথা কয় না।

গোপাল ভাণ্ডারী বলিল, "আরে চক্ষু বুজে ছুটছো কোথায় নটবর দা। তোমার বয়স কি উজান বইতে লাগলো না কি?"

নটবর বলিল, "বইবে না দাদা, এখানে স্বয়ং গোপাল, সাক্ষাৎ নব-বৃন্দাবন—সবই উজান বয়—সর্ব্ব উল্টা।"

গোপাল একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে নটবর দা'।"

পরামর্শ হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রে নটবরের পাট ক্ষেত কাটিয়া সান্ন্যাল ম'শায়দের প্রজারা লইয়া তাহাদের বাড়ীর সামনে জাগ দিয়া রাখিল। নটবরকে চুপ করাইবার জন্য দশ মণ পাট তার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া গেল।

কুঞ্জ সাহা ক্রমে মোকদ্দমা করিল। নটবরকে সাক্ষী মানিল। নটবর এবার গোপালের কাছে টাকা খাইয়া উধাও হইয়া গেল। কুঞ্জ সাহা তাহাকে দিয়া সাক্ষী দেওয়াইতে পারিল না। গোপালের তদ্বিরের চোটে সেঁ ক্ষেত সান্ন্যাল মহাশয়দের জমীদারীর অধীনে গোপালের দখলি জোত সাব্যস্ত হইয়া গেল। কুঞ্জ সাহার স্বত্বের নালিস করিতে হইল। ইহাতে নটবরের মোট লাভ হইল দশ মণ পাটের মূল্য শতাধিক টাকা।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্বত্বের মোকদ্দমায় কুঞ্জ সাহা গোপালের কাছে জমী ও মোটা হাতে খেসারত আদায় করিয়া লইল।

এমনি করিয়া আরও কয়েক বৎসর চলিল। কেমন করিয়া চলিল, তা' এক কথায় বলা কঠিন। কিন্তু এমনি করিয়া যোড়া তাড়া দিয়া দিন চলিল। কিন্তু দিন ক্রমশঃই কঠিন হইয়া আসিল।

সতীশ বি-এ পরীক্ষায় আবার ফেল করিয়া পনেরো টাকা মাহিনার একটা চাকরী লইয়া ঢাকায় আছে। তাতে তার কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। কিন্তু তার সর্ব্বদাই মনে মনে আশা আছে যে, এমন দিন থাকিবে না, একটা উপায় হইবেই। সেই আশায় সে এদিক সেদিক নানা ফিকিরফন্দীতে ঘোরা ফেরা করে; কিন্তু কোনও সুরাহা করিতে পারে না।

এদিকে বাড়ীর অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হইয়া উঠিল। মেরামতের অভাবে বাড়ী ক্রমে জীর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশের কঙ্কালসার রোগজীর্ণ পুত্র-কন্যায় আঙ্গিনা পঙ্কিল হইয়া উঠিল। শুইবার কাঁথা ও পরিবার কাপড় ক্রমে জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া উঠিল। উপযুক্ত গাত্রাবরণের অভাবে সতীশের স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিল। ভরপেট খাওয়ার রেওয়াজ উঠিয়া গেল, নুন-ভাত ও আপন হাতে ধরা মাছে—তেল ও মশলা ছাড়া ঝোল একেবারে বিলাসের চরম দাঁড়াইয়া গেল।

এক দিন নটবর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "বউমা, তুমি কেন এখানে পড়ে এত কষ্ট পাও? তুমি যাও না তোমার বাপের বাড়ী।"

বউ সেদিন সারা দিন কাঁদিয়া ভাসাইল। শ্বাশুড়ী অনেক সাধিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। এমনি করিয়া দিন চলিল। নটবরের

রসিকতার রস কমিয়া আসিল। পরিমাণও কমিল এবং ঝাঁজ বাড়িয়া চলিল।

দুঃখে পড়িয়া নটবরের মনে হইল যে, কুঞ্জ সাহা তার কাছে যে প্রস্তাবটা দুই বৎসর আগে করিয়াছিল, সেটা শুনিলে তার হয় তো আজ এত দুর্গতি হইত না। আজ যে সে এদিক সেদিক ঘুরিয়া হয়রাণ হইয়া উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, এ দশা তার হইত না। কিন্তু সে কথা সে যে গ্রাহ্য করে নাই, সেটা ভালই করিয়াছে। কুঞ্জ সাহা তাহাকে দয়ার প্রত্যাশী মনে করিয়া এই উপকার ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল। এমন দান তো নটবর কোনও দিনই লয় নাই। কুঞ্জ সাহার কাছে যে সে প্রথমে পাঁচ শো টাকা লইয়াছিল, সে তো তার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার। আজ এই দারুণ দৈন্যে পড়িয়াও নটবর এক দিনের তরেও কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহে নাই, কারও দয়ার দান গ্রহণ করে নাই।

এক দিন সে জেলের কাছে মাছ কিনিতে গিয়া একটা মাছ ধরিল। জেলে তার যা' দাম চাহিল, তাহা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চার আনার মাছ সে কেমন করিয়া কিনিবে। নটবর বিরস বদনে ফিরিতেই, জেলে বলিল "দাস ম'শায়, নিয়ে যান মাছটা, যা' হয় দেবেন।"

কথা শুনিয়াই নটবর ক্ষেপিয়া উঠিল। হায়, এই দীন ধীবরও তাকে দয়া করিয়া ভিক্ষা দিতে চায়! সে খুব চটাচটি করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

কাজেই বড় কষ্টে দিন চলিল। নটবর কাহাকেও কিছু বলিত না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার সে যতদূর সম্ভব আগের মতই করিত; কিন্তু তার ভিতরটা যে শুকাইয়া উঠিতেছে, তাহা সবাই অল্প বিস্তর টের পাইত।

সতীশের কোনও কিছুই সুবিধা হইল না। এদিকে নাতি-নাতিনীতে নটবরের ঘর ভরিয়া উঠিল। ইহাদের দিকে চাহিতে নটবরের অন্তর আনন্দে প্লাবিত হইয়া উঠিত। সে যতক্ষণ পারিত, এই শিশুদের খেলা দিত। খেলা দিয়া শিশুদের আনন্দ দিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নটবরের। যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকিত, শিশুরা হাসিয়া বাড়ীটি একেবারে মুখর করিয়া রাখিত—তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত।

কিন্তু নটবর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিত না যে এই শিশুদের ক্ষুধা সে মিটাইতে পারিতেছে না, ইহাদের বসন ভূষণ সে কিছুই জোগাইতে পারিতেছে না। এ কথা মনে হইলেই তা'র প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত। নাতিদের আনন্দে ছুটিয়া কোলে করিতে যাইয়া কতবার সে হঠাৎ তাদের ফেলিয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছে এই জন্য।

একদিন বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল বাড়ীর পিছনে খানিকটা কাদা লইয়া বড় নাতি একটা চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে খুব মাথামাখি করিয়া খেলিতেছে। এই চাঁড়ালটির বাড়ী নটবরের ঘর হইতে বেশী দূরে নয়। ইহারা নটবরের অত্যন্ত অনুগত। যুধিষ্ঠির নমোদাস মজুরী খাটে, ক্ষেত চষিয়া অনেক শস্য ঘরে তোলে। কৃষাণদের মধ্যে সে একজন অবস্থাপন্ন লোক। তার বাড়ীতে একখানা টিনের ঘর আছে। গরু বলদে চার জোড়া, আর একটা বোঝা বহিবার ঘোড়া তার আছে। চাষ আবাদের অবসরে সে বর্ষাকালে নৌকার মাঝিগিরি করে; অন্য সময় গরুর গাড়ী চালায়, ঘোড়া ভাড়া দেয়। এমনি করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে তার ছেলেপিলে খায়দায় ভাল।

চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে এমনি এক হইয়া মিশিয়া নাতিকে খেলিতে দেখিয়া নটবরের হঠাৎ ঘৃণা বোধ হইল। ভদ্রলোকের ছেলে চাঁড়ালের

ছেলের সঙ্গে এত মেশামেশি কিসের? সে নাতিকে ডাকিয়া বকিল। শুনিয়া অম্বিকাও বলিল, "তাই তো, যত সব ইতর ছোটলোকের সঙ্গে ছেলেটার মেশামেশি—তাই তো ছেলের ভদ্রলোকের মত কোনও ছিরিই হচ্ছে না।"

এমনি কথা নটবরও বলিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখে তার নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়া তার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তার আভিজাত্যের গর্ব্ব ধুলায় মিশিয়া গেল। যুধিষ্ঠির নমোদাস শরীর খাটাইয়া খায়, কিন্তু তার স্বচ্ছল অবস্থা, সে কারও কাছে হাত পাতে না, বেশ খায় দায়, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে বেশ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে পালন করে। নটবর ভদ্রলোক, শরীর খাটাইতে পারে না। তার ছেলে সতীশ শরীর খাটাইতে নারাজ—তারা খোঁজে এমন কোনও উপার্জ্জনের উপায় যাতে শরীর খাটাইতে হয় না, অথচ কৃষকের অন্ন অনায়াসে আপনার পেটে আসে। তাই নটবর হা অন্ন হা অন্ন করিতেছে, স্ত্রীপুত্রদিগকে পালন করিতে পারিতেছে না। আর সেই তার আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা লইয়া তার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ওই যুধিষ্ঠিরের ছেলেকে অত্যন্ত ছোটলোক বলিয়া তফাৎ করিতে চায়।

নটবরের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল। "দুত্তোর" বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। স্থির করিল, শরীর খাটাইয়া কিছু রোজগার না করিয়া সে ঘরে ফিরিবে না। অন্ততঃ যুধিষ্ঠিরের সমান সম্পন্ন না হইতে পারিলে সে আর তার আভিজাত্যের গৌরবটা কিছুতেই মনে জিয়াইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

৬

সে হাটখোলায় গেল। মহাজনদের কাছে সে প্রস্তাব করিল যে সে নৌকার মাঝির কাজ করিবে। যাহাদের নৌকা আছে তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করিল। সকলেই ইহা নটবর দাসের একটা প্রকাণ্ড পরিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়া হাসিয়া অধীর হইল। গতিক সতিক দেখিয়া নটবরও শেষ পর্য্যন্ত বুঝিল যে ব্যাপারটাকে পরিহাসের আবরণে ঢাকিয়া বিদায় হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। সে শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া খুব খানিকটা হাসি মস্করা করিয়া বুকভরা ব্যথা লইয়া বাড়ী ফিরিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল।

সে বাস্তবিকই খুব সুদক্ষ নাবিক। তার মত নৌকা বাহিতে বা হাল ধরিতে কোনও মাঝির ছেলে পারে কি না সন্দেহ। তবু তার পক্ষে নৌকার মাঝিগিরি করা একেবারেই অসম্ভব! হায় রে তার এই একমাত্র বিদ্যা কেহ মূল্য দিয়া কিনিতে চায় না, কেন না সে ভদ্রলোক। তার এই আভিজাত্যই তার জীবিকা উপার্জ্জনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কুঞ্জলাল সাহাও হাট হইতে ফিরিয়া এই পথে চলিয়াছিল। নটবরের কথা শুনিয়া তার মনে খটকা লাগিয়াছিল। তাই সে নির্জ্জন পথে নটবরের সঙ্গে জুটিল। পিছন হইতে সে ডাকিল "দাস মশাই!" নটবর পিছনে চাহিয়া কুঞ্জলালকে দেখিয়াই চোঁ-চাঁ ছুট দিল। কুঞ্জলালের কাছে সে ঠিক এই সময় কিছুতেই হাজির হইতে পারে না। তবে তার মান ইজ্জত একেবারে যাইবে। দুনিয়ার আর সবার কাছে সে সব মান বিসর্জ্জন করিয়া চাষী মজুর হইতে প্রস্তুত; কিন্তু এই কুঞ্জলালটির কাছে সে তার ইজ্জত একটুও খোয়াইতে রাজী নয়। তা' ছাড়া এখন যে তার বুক

ফাটিয়া কান্না আসিতেছে—এ কান্না যদি কুঞ্জলালের কাছে ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে তবে যে তার মাথা কাটা যাইবে। তাই সে ছুটিয়া পলাইল। তা ছাড়া, তার সন্দেহ হইল যে কুঞ্জলাল বুঝি আজ তাহার ঘাড়ে আর কোনও দায় বা অনুগ্রহ চাপাইতে আসিতেছে।

নটবরকে ছুটিতে দেখিয়া কুঞ্জ সাহা প্রথমে অবাক্‌ হইয়া গেল। তার পর অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে ইহার যথার্থ কারণ কতকটা আঁচ করিল। দুই বৎসর আগে নটবর তাহার কাছে গিয়াছিল—কোনও রকম সাহায্য পাইবার আশায়ই গিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। বরং যখন কুঞ্জ সাহা নিজে সাহায্য করিবার ইচ্ছায় ছেলেকে তার ব্যবসায়ে নিতে চাহিল, তখন নটবর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া কুঞ্জ সাহা অনেক দিন ভাবিয়াছে। তার পর, সে খবর পাইয়াছে নটবরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সতীশেরও চাকরী-বাকরি বিশেষ কিছু হয় নাই। তবু নটবর একটি দিন টাকা ধার করিবার জন্যও তার কাছ দিয়া ভিড়ে নাই।

এই সমস্ত কথা গভীর ভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কুঞ্জ সাহা বাড়ী না গিয়া নটবরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না; তাই সে তখন তার বাহিরের উঠানে বসিয়া ঠাণ্ডা হইতেছিল। কুঞ্জ সাহা হাসিয়া বলিল, "প্রাতঃ প্রণাম দাস ম'শায়।"

"এই যে সাহজী যে" বলিয়া নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে নানা কারণে বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কারণ এই যে, যে জলচৌকির উপর বসিয়া নটবর আরাম করিতেছিল, তাহা ব্যতীত দ্বিতীয় আসন সেখানে ছিল না। কুঞ্জ সাহাকে দাঁড় করাইয়া সে আসনে বসিতে পারিতেছিল না। অথচ কুঞ্জ সাহা জাতে সাহা, অভিজাত কায়স্থ হইয়া নিজে দাঁড়াইয়া সাহাকে ওই চৌকীতে বসিতে বলিতেও দ্বিধা হইতেছিল।

এবং ঠিক সেই কারণে নিজে বহিয়া কুঞ্জ সাহার জন্য দ্বিতীয় আসন সংগ্রহ কারিতেও সে সঙ্কুচিত হইতেছিল। "ভদ্রলোকের" বাড়ীতে সাহা-মহাজন যত কেন বড় লোক হউক না, সমান আসন তো পাইতে পারে না!

কুঞ্জ সাহা এ সকল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়ে এলাম দাস ম'শায়। আমার চারখানা পাটের নৌকা পরশু দিন নারায়ণগঞ্জ না পাঠালেই নয়। তার সঙ্গে যাবার কথা একজন গোমস্তার; তা' তার হ'য়ে প'ড়েছে অসুখ। আমার অন্য লোকও নেই। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার না করেন, তবে আমার অনেকগুলি টাকা লোকসান যায়।"

উপকার করিতে নটবর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দ্বারা কিরূপে সাহজী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন?

সাহজী বলিল, "আপনাকে তো ব'লতে পারি না সাহস করে,' তবে আপনি যদি নৌকা ক'খানা নিয়ে যেতেন তবেই হ'ত।"

"আমাকে তো আপনি গোমস্তা করে' পাঠাতে চান, তা আমি তো এ সব কাজ কিছুই জানি না।"

কুঞ্জলাল জিভ কাটিয়া বলিল, "আরে বাপ! আপনাকে আমি গোমস্তা করবো এমন সাধ্য কি? আপনি কেবল দয়া করে পাটগুলি সঙ্গে নিয়ে পৌছে দেবেন। আমার সেখানে গোমস্তা আছে, তারা সব বুঝে নিয়ে যা' করতে হয় করবে।"

নটবর হাতে স্বর্গ পাইল। সে অবশ্যই রাজী হইল। কুঞ্জলাল এই সাধু বঞ্চনা করিয়া নটবরের হাতে কিছু মোটা টাকা গছাইয়া দিলেও তার লোকসান হইল না। কেন না গোমস্তা তার একজন পাঠাইতে হইত, আর নটবরের চেয়ে অনেক কাজের লোক সে পাইতে পারিলেও তার চেয়ে বিশ্বাসী লোক পাইত না।

৭

এক শত টাকা রোজগার করিয়া নটবর যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সে পা তুলিতে পারে না। তিন দিন হয় তার জ্বর; তাই লইয়া সে লম্বা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে।

বড় উৎসাহ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে। সে যে কেবল কিছু টাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়; এমনি আরও রোজগারের পথও এখন হইতে পারিবে। তা' ছাড়া একবার সে ভাবিয়াছিল যে, এখন সে ছেলেকে আনিয়া কুশলালের সঙ্গে কারবারে লাগাইয়া দিতেও পারে। কিন্তু ঢাকায় সতীশের সঙ্গে দেখা করিয়া সে শুনিতে পাইল যে, তার এক জমীদার সতীর্থ এত দিনে তার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এত দিন সে এক সামান্য জমীদারের মুহুরিগিরি করিতেছিল, এখন এই বন্ধু তাহাকে একটা ভাল ডিহির নায়েবীতে নিযুক্ত করিয়াছেন। বেতন চল্লিশ টাকা। তা' ছাড়া তহরী ইত্যাদি উপরি আছে, উৎকৃষ্ট বাড়ী ঘর, স্বাস্থ্যকর স্থান ইত্যাদি যত রকম সুবিধা থাকিতে হয় আছে। সতীশ গিয়া কাজের ভার লইয়াই দেশে গিয়া 'সবাই'কে লইয়া যাইবে।

এত দিনে দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন ভাবিয়া, নটবর জ্বর সত্ত্বেও উৎফুল্ল হৃদয়ে ক্লান্ত চরণে বাড়ী ফিরিল। ঘুসঘুসে জ্বর চলিল। সাত দিন পর সতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মায়ের কাছে সতীশ বলিল, "মা, ওদের নিয়ে যেতে চাই সেখানে।"

অম্বিকা একেবারে আকাশ হইতে পড়িবার মত মুখ করিয়া ছেলের দিকে চাহিল। একবার তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল। নটবর যে বড় আশা করিয়া আছে যে, সতীশ আসিয়া তাহাদের সকলকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবে।

আর সতীশ বলে কি না সুধু বউকে লইয়া যাইবে। এ কথায় স্বামী তার যে কতটা নিরাশ হইবে তা' ভাবিতে অম্বিকার মুখে কথা সরিল না। পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "তা যাও, যাবে বই কি? আমরা তো তা' ঠিকই ক'রেছি!"

সতীশের স্ত্রী বরাবরই ছোট্ট বউটি হইয়া আছে, স্বামীর কাছেও এখনও তার মুখ ফোটে নাই। নটবর ও অম্বিকা যে সতীশের সঙ্গে যাইবার কথা লইয়া কত জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন, আর তাহাতে কত আনন্দ করিয়াছেন, তাহা তার জানা ছিল। কিন্তু সে শ্বাশুড়ীর মনের ভাব পরিষ্কার বুঝিলেও স্বামীর কাছে খুব খোলসা করিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হইল। সে কেবল বলিল "মা-বাবাকে নিয়ে চল।"

সতীশ বলিল, "এখন তো আমার টাকায় কুলোবে না। তা ছাড়া, সব শুদ্ধ সেখানে গেলে এখানে বাড়ী ঘর দেখে কে? আর সবশুদ্ধ সেখানে গেলে খরচ চলা কঠিন হ'বে; বাবা মাকে বরং এর পরে একবার নিয়ে ঘুরিয়ে আনা যাবে।"

সতীশের স্ত্রী বলিল, "আহা, তাঁরা এত আশা করে আছেন, তুমি তাঁদের নিয়ে যাবে।"

সতীশ। আশা করে থাকলেই তো হয় না, রাহাখরচের টাকাও থাকা চাই। আমার কাছে যা' আছে, তাতে কেবল তোমাকে আর ছেলে-পিলেকে নিয়ে যেতে পারি। সে তো আর এ দেশে নয়!"

বউ বেচারী হার মানিল। কিন্তু সে বলিল, শ্বশুরের অসুখ ফেলিয়া সে কেমন করিয়া যায়?

সতীশ সে সব বোঝে, কিন্তু তার ছুটি তো নাই। তা' ছাড়া সামান্য একটু জ্বর, এর জন্য এমনই কি! ইত্যাদি।

নটবর পরে বলিল, "আমার জন্যে তোমার থাকবার দরকার নেই

বউমা; তুমি এসো গে,—ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর। যখন মেয়ের বিয়ের দরকার হ'বে, তখন কিন্তু এ বুড়ো জামাইকে ভুললে ছাড়ছিনে।"

সতীশ পরের দিন স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া চলিয়া গেল। নটবর ও অম্বিকা তার পর অনেকক্ষণ কেবল পরস্পরের মুখ চাহিয়া বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল কোনও কথা বলিতে পারিল না।

শেষ পর্য্যন্ত নটবর বলিয়া ফেলিল, "এরি জন্ম মানুষ জন্মায় মরে। ছেলেটি মানুষ করে দিয়ে ঋণশোধ, তার পর ছেলেও পোঁছে না, ঈশ্বরও ফিরে চায় না।...গিন্নী, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এত দিনে যে আমাদের বয়সটা অনেক হ'য়ে গেছে। এখন বিদায়ের সময় এসেছে।"

অম্বিকা একবার চোখ মুছিল, কোনও কথা বলিল না।

নটবরের জ্বর বাড়িয়া গেল। এক দিন কবিরাজ আসিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়া গেলেন। নটবর তখন বেশ শান্তভাবে ঘুমাইতেছে, কিন্তু কবিরাজের চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিলে নটবর বলিল, "বড় ঠকিয়েছে গিন্নী; লক্ষ্মীঠাকরুণ বড় ঠকিয়েছে। এত দিন মুখ ফিরিয়ে বসে থেকে শেষকালে কি ঠাটাটাই ক'রলে। টাকা দেবার বেলা ফাঁকি দিয়ে শেষে প্রাণটাকে ঠকিয়ে নিলে!"

এই শেষ পরিহাসের হাসি তার অধরোষ্ঠে মিলাইবার আগেই নটবর চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

সমাপ্ত